স্বপনবুড়ো

স্বপনবুড়োর রকমারি গল্প

স্বপনবুড়ো

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

স্বপনবুড়োর রকমারি গল্প :

হারানো রতন - ৫
শঙ্কররামের সঙ্কট - ১৫
বৈদ্যনাথের ব্যবসা - ২১
কান-কথার কেরামতি - ২৯
স্বাধীনতার মজা - ৩৪
জন্মদিনে - ৩৯
শহীদ বেদী - ৪৭
শিকল খোলার খেলা - ৬১

স্বপনবুড়োর রকমারি গল্প

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৩
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা—১২
ছেপেছেন
গৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলকাতা—৬
প্রচ্ছদ ও ছবি এঁকেছেন
শৈল চক্রবর্তী
এক টাকা চার আনা

হারানো রতন

হঠাৎ সেদিন হেডমাষ্টাব মশাই স্কুলসুদ্ধ সব ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে ছাত্র-মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল।

গণেশ বললে, নিশ্চয়ই কোনো ছেলে কিছু অন্যায় কাজ কবেছে···সকলেব সামনে তাব সাজা হবে।

বটু বললে, না, না, 'প্রাইজ ডে'-তে কী অভিনয় হবে মাষ্টার-মশাই সেই সম্পর্কে কী যেন বলবেন।

ভজা একটু ভীতু। আস্তে আস্তে বললে, বোধকরি ইন্সপেক্টর আসবে, তাই ডাক পড়েছে।

এমনি যার মনে যা এলো, সে তাই দিয়ে আলোচনাটি এগিয়ে নিয়ে চললো।

কথার পর কথা এমনিভাবে বেড়েই চলত যদি না ঢং ঢং করে ঘণ্টার আওয়াজ সবাইকে জানিয়ে দিত যে, এখন হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করবার সময়।

মুখের কথা মুখে রেখে যে-যার মতো ছুটল ইস্কুলের বিরাট প্রাঙ্গণে।

সেখানে পৌঁছুতে দেখা গেল অনেক ছেলে আগে থেকেই সেখানে জড় হয়ে আছে। শুধু হেডমাষ্টার মশায়ের আসতে যা' একটু দেরি।

হঠাৎ জুতোর মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ শুনে ছেলের দলের বুঝতে বাকি রইল না যে এরই জন্যে তারা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

হেডমাষ্টার মশাই চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর ধীর-গম্ভীরভাবে বললেন, আর কারো আসতে বাকি নেই তো ?

ছেলের দল সোল্লাসে চিৎকার করে বললে, না স্যর, আমরা সবাই এসে হাজির হয়েছি।

তখন তিনি সকলকে ডেকে বললেন, দেখ, আজ ইস্কুলে আসবার পথে আমি একটি দামী আংটি হারিয়েছি। আমার নিজের আংটি হলে তোমাদের কিছু বলতাম না, কিন্তু এটি আমার বাবার দেওয়া জিনিস। বাবা আজ নেই, আছে তাঁর স্মৃতি। তোমাদের ভেতর যে এই আংটি খুঁজে বের করতে পারবে—পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাকে আমি একটি বিশেষ পুরস্কার দেবো।

হেডমাষ্টারের মুখে একটা নতুন ধরণের 'অভিযানে'র কথা শুনে ছেলের দল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।

ভুতো বললে, যাক, রোজ অঙ্ক করে আর নামতা পড়ে হাই উঠছিল—একটা সত্যিকারের কাজ পাওয়া গেল। আগের জন্মে আমি বোধকরি কোনো যুদ্ধের সেনাপতি ছিলাম। এ আংটি আমিই খুঁজে বার করবো।

ভীতু ভজা বললে, বয়ে গেছে এখন রোদে-রোদে আংটি খুঁজতে। বই-টই গুছিয়ে—বাড়ি গিয়ে এখন একটা লম্বা ঘুম দেবো।

বটু বললে, প্রাইজ যখন রয়েছে তখন খুঁজে দেখতে হবে বৈকি ! লেখা-পড়ায় তো আর পুরস্কার পাবো না,—দেখি আংটি খুঁজে একটা ভালরকম কিছু পেতে পারি কি না।

ইস্কুল-সুদ্ধ সব ছেলে মহা উল্লাসে হৈ-হৈ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল।

গণেশ মহা খুশি—কেনং না, পণ্ডিতমশায়ের শব্দরূপের হাত থেকে আজকের মতো রেহাই পাওয়া গেছে।

ইস্কুলের মাঠ যখন একেবারে খালি হয়ে গেল—দেখা গেল, একটি ছেলে ফ্যাল-ফ্যাল করে চারদিকে বোকার মতো তাকাচ্ছে।

লিকলিকে কালো চেহারা, পাঁজরের হাড়গুলো বোধকরি গায়ের চামড়ার ওপর দিয়েই গোনা যায়। মা-বাপ ওর নাম কী দিয়েছিল সেটা শুধু ইস্কুলের খাতাতেই লেখা আছে—সবাই ওকে ডাকে বোকচন্দ্র বলে।

বোকচন্দ্র সত্যিই বোকচন্দ্র। ও নিজেও জানে বোকা ছাড়া সে আর কিছুই নয়। কাজেই বোকচন্দ্র বলে ডাকাতে সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয় না—ভাবে, ঐ নামই তার পাওনা।

ছেলের দল যখন জলের স্রোতের মতো বেরিয়ে গেল আংটি খুঁজতে—ও মনে ভাবলে, এ কাজ কি ওর দ্বারা সম্ভবপর হবে? তাই কী করবে ঠিক করতে না পেরে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সকাল-সকাল ছুটি হওয়াতে ইস্কুলের দপ্তরি বাড়ি যাচ্ছিল। মাঝপথে বোকচন্দ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর ভারি মজা লাগল। বললে, এ কি বাবু, আপনি ওখানে যান নি—?

বোকচন্দ্র ভয়ে-ভয়ে বললে, আমি পারবো আংটি খুঁজে বের করতে?

দপ্তরি বোকচন্দ্রকে চিনতো। তাই চোখের হাসিখুসি গোপন করে একটু ঠাট্টার ভাবে বললে, আপনি বলছেন কী বাবু! আপনি পারবেন না? আমার মনে হয় আংটি সকলের আগে আপনার চোখেই পড়বে। হেডমাষ্টার মশাইও তাই বলছিলেন।

শুনে বোকচন্দ্রের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, য়্যাঁ! হেডমাষ্টার মশাই বলেছেন এই কথা? তবে আমি নিশ্চয়ই যাবো। তুমি আমার বইগুলো ধর তো—

দপ্তরিকে আর কিছু বলবার ফুরসৎ না দিয়ে তারই হাতে বই-খাতাপত্তর গুলো গুঁজে দিয়ে বোকচন্দ্র ছেলের পাল যেদিকে গেছে, সেই দিক পানে এক চোঁচা দৌড় লাগালো।

বোকচন্দ্র যখন মাথা নিচু করে একটা গোঁ করে দৌড়তো তখন সে ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটতে পারতো। কাজেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে ছেলের দলকে ধরে ফেললে।

তাকে আসতে দেখে ছেলের দলের সবাই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, হেডমাষ্টার মশাই তোকে পাঠিয়েছেন নাকি? আংটি কি তবে পাওয়া গেছে?

বোকচন্দ্র প্রকাণ্ড একটা দম নিয়ে বললে, নাঃ, আমি তো আংটি খুঁজতে আসছি। তিনি বলেছেন, সক্কলের আগে আংটি আমার চোখেই পড়বে।

এইবার ছেলেদের হাসবার পালা…হো—হো—হো—হা—হা—হি—হি—কারো হাসি আর থামতে চায় না!

বোকচন্দ্র বললে,—আচ্ছা, দেখে নিস।

তারপর আপন মনে মাথা নিচু করে আবার পথ চলতে শুরু করলে।

খানিক দূরে গিয়ে বোকচন্দ্র দেখলে একটা গোরু ডোবার ভেতর পড়ে কাদায় পা আটকে যাওয়ায় আর উঠতে পারছে না।

গোরুটা অসহায়ের মতো উপর দিকে মুখ তুলে ক্রমাগত হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে।

বোকচন্দ্র ছেলেদের দিকে ফিরে বললে, ওরে—আয় সবাই, গোরুটাকে আমরা টেনে তুলি, নইলে ও মরে যাবে—

একটি ছেলে বললে, তবেই তুই আংটি খুঁজে পেয়েছিস!—চলরে আমরা সবাই যাই।

অন্য একটি ছেলে ফোড়ন দিয়ে বললে, এটা আর বুঝতে পারছিস নে? হেডমাষ্টার মশাই আমাদের পাঠিয়েছেন আংটি খুঁজতে আর ওকে পাঠিয়েছেন গোরু খুঁজতে। যার যা কাজ!

ছেলের দলে আবার হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। কিন্তু কেউ আর ওর জন্যে দাঁড়িয়ে রইল না। পুরস্কারের লোভে আংটি খুঁজতে-খুঁজতে সবাই চললো এগিয়ে।

বোকচন্দ্র তখন গোরুটার দড়ি ধরে অনেক কষ্টে সেটাকে ডাঙায় টেনে তুললে। তারপর আবার ছুটল সেই হারানো রতনের সন্ধানে।

দেখা গেল,—ছেলের দল তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

আরো খানিকদূর পথ চলতে বোকচন্দ্র দেখতে পেলে একটি ছোট্ট মেয়ে রাস্তার ধারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ও চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, যতদূর চোখ যায় কেউ কোথাও নেই।

সে আস্তে আস্তে মেয়েটির কাছে দাঁড়ালো। ওকে দেখে খুকুমণির কান্না আরো বেড়ে গেল।

অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বোকচন্দ্র জিজ্ঞেস করলে, তোমার কী হয়েছে খুকী?

খুকী চোখের জল মুছতে মুছতে বললে,—আমি হারিয়ে গেছি।

বোকচন্দ্র বুঝতে পারলে,—হয়ত আশেপাশের পাড়ার কোনো বাড়ির মেয়ে হবে। তাই খুকীকে কোলে তুলে নিয়ে ও পাড়ার ভেতর ঢুকল। পর পর দু' বাড়ির ভেতর গিয়ে কোনো সাড়া-শব্দ পেলে না। তৃতীয় বাড়িতে গিয়ে দেখলে, কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

মেয়ের মা উঠোনের মধ্যে পড়ে আছাড়ি-বিছাড়ি করে কাঁদছে। বোকচন্দ্রের কোলে খুকুকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বুকে টেনে নিলে।

বাড়ির সবাই বোকচন্দ্রকে কত করে মিষ্টিমুখ করে যেতে বললে, কিন্তু সে কিছুতেই শুনল না,—আবার ছুটলো আংটির খোঁজে।

ইতিমধ্যে ছেলের দল একটা বিলের ধারে গিয়ে পৌঁছেছে। নৌকোতে এই বিল পার হয়ে তবে ইস্কুলে আসতে হয়।

বিলের জলে একটি মাঝির ছেলে ক্রমাগত ডুবে ডুবে কাদার ভেতর থেকে মাছ ধরবার চেষ্টা করছিল।

ছেলের দল ভাবলে নিশ্চয় এখানে হেডমাষ্টার মশায়ের আংটি পড়ে গেছে আর ঐ ছেলেটা তা জানতে পেরেছে। নইলে ও খালি ডুবে-ডুবে খুঁজছে কী?

যেমনি একথা ভাবা, সবাই দল বেঁধে হুড়োহুড়ি করে একেবারে জলে নেমে পড়ল।

সকলেরই ইচ্ছে, ঐ একটা জায়গায় গিয়ে ডুবে দেখে।

কাজেই লেগে গেল ঝগড়া। এর নাক গেল চেপ্টে, ওর মাথা গেল থেঁতলে, ওর পা গেল মচকে—একেবারে অনর্থ ব্যাপার!

ডুবে ডুবে সবাই হয়রাণ, তবু আংটির হদিস পাওয়া গেল না।

সকলের গায়ে, মাথায়, পায়ে কী ঝনঝনানি ব্যথা! তখন আর উপায় না দেখে ছেলের দল খুঁড়িয়ে ইস্কুল-মুখো রওনা হল।

এই ঘটনার অনেকক্ষণ বাদে বোকচন্দ্র এসে সেই বিলের ধারে উপস্থিত হল।

দেখলে, বিলের ধারে বসে একটি মাঝির ছেলে ধুঁকছে!

বোকচন্দ্র বললে, তুমি ধুঁকছ কেন? তোমার কী হয়েছে?

মাঝির ছেলে বললে, সারাদিন মাছ ধরে ধরে আমার জ্বর এসে গেছে। শীতে আমার শরীর কাঁপছে—আমি বাড়ি যেতে পারছি না।

বোকচন্দ্র তখন নিজের উড়নিটা খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে, এইবার শীত কম লাগবে—তুমি বাড়ি যেতে পারবে।

মাঝির ছেলে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, তুমি বড় দয়ালু বাবু, এইবার আমি বাড়ি পৌঁছতে পারবো।

আচ্ছা, এসো।—বলে বোকচন্দ্র চলে যাচ্ছিল—মাঝির ছেলে তাকে বললে, শোনো বাবু, আমি অনেকগুলো মাছ ধরেছি, একটা তুমি নিয়ে যাও—বাড়ি গিয়ে তোমার মাকে দিও বাবু, ঝোল রান্না করে দেবে—

বোকচন্দ্র বললে—তুমি কষ্ট করে মাছ ধরেছ, আমায় দেবে কেন?

মাঝির ছেলে জবাব দিলে, না—না—বাবু, আমি খুশি হয়ে তোমায় খেতে দিচ্ছি—তুমি নেবে না কেন?

তারপব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, তোমার বড় দয়ার শরীর বাবু! এমন মিঠে কথা কোনো বাবুর মুখে শুনি নি!

মাঝির ছেলেব কথা শুনে বোকচন্দ্রও ভারি খুশি হল। কেননা তার কথা মিষ্টি এ কথা সে আজ নতুন শুনছে। সে চিরকালের বোকচন্দ্র—সকলের ঠাট্টা আর টিটকিরি শুনেই তার দিন যায়।

মাঝির ছেলের কথা শুনে মনে হল—তার জীবনটা আজ সার্থক।

মাছ নিয়ে হৃষ্টমনে সে ফিরে চললো—আংটির কথা তার একবারও মনে এলো না।

ততক্ষণে ইস্কুলের ময়দানে এক বিরাট সভা বসে গেছে।

হেডমাষ্টার মশাই ছেলেদের চেহারা দেখে আঁৎকে উঠলেন, বললেন, এ জানলে তোমাদের কিছুতেই আমি পাঠাতাম না। তোমাদের পাঠালাম একটা কাজে আর তোমরা নিজেরা ঝগড়া

করে ফিরে এলে ? তোমাদের নাক-মুখ-গা-পায়ের এ কী দশা হয়েছে !

ছেলেরা এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে—সত্যি, চেহারা এক-একজনের ভূতের মতো হয়ে উঠেছে বটে !

কিন্তু সবাই ফিরে এসেছে—বোকচন্দ্রের দেখা নেই।

হেডমাষ্টার মশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে ছেলেটির তো বুদ্ধি-সুদ্ধি কম, তাকে তোমরা একলা ফেলে এলে কোথায় ?

ছেলেরা বললে, সে তো আমাদের সঙ্গে যায় নি,—আপন মনে কোন পথে গেছে আমরা আর তাকে দেখি নি !

আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে হেডমাষ্টার মশাই বললেন, এ তো ভাবনার কথাই হল—তাহলে আমি নিজেই বেরুচ্ছি ছেলেটার খোঁজ করতে—

কিন্তু তাঁকে আর বেরুতে হল না। কেননা সেই সময় হঠাৎ ধূমকেতুর মতো বোকচন্দ্র ডান হাতে একটা মাছ নিয়ে ইস্কুলে হাজির হল।

ছেলের দল তাকে এইভাবে দেখে নানারকম টিটকিরি দিতে লাগলো।

গণেশ বললে—দে না মাছের মুড়োটা—বাড়ি গিয়ে মুড়িঘণ্ট রেঁধে খাব—

বোকচন্দ্র সরল মনে বললে, আচ্ছা, তা নাও না।—তারপর পকেট থেকে ছুরি বের করে মুড়োটা কেটে ফেললে।

অবাক কাণ্ড !

সঙ্গে-সঙ্গে মাছের পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ঝকঝকে এক হীরের আংটি।

হেডমাষ্টার মশাই লাফিয়ে উঠে বললেন, ঐ তো আমার হারানো আংটি ! তারপর খুশি হয়ে বোকচন্দ্রকে কাছে টেনে

নিয়ে বললেন—হ্যাঁ রে, তোর ফিরতে এত দেরি হল কেন? আর এ মাছই বা কোথায় পেলি?

বোকচন্দ্রের মুখখানা তখন আনন্দে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

একে তো হেডমাষ্টার মশায়ের আংটি পাওয়া গেছে—তার ওপর আদর করে তিনি ওকে বুকে টেনে নিয়েছেন।

কিছুক্ষণ তো ওর মুখ দিয়ে কোনো কিছুই বেরুলো না। তারপর ধীরে ধীরে ও সব কথা খুলে বললে। কী করে একটা গোরুকে কাদা থেকে টেনে তুলে বাঁচালে, কী করে খুকীকে ফিরিয়ে দিলে মায়ের কোলে, কী ভাবে নিজের চাদর দিয়ে মাঝির ছেলেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে আর তার কাছ থেকে পেলে এই মাছ।

হেডমাষ্টার মশাই খুব মন দিয়ে তাঁর বোকা ছাত্রের কাহিনী শুনলেন। তারপর ছেলের দলকে ডেকে বললেন, আমার এই বোকা ছাত্রটি আমাদের সবাইকে আজ মস্ত বড় শিক্ষা দিয়েছে।

শুনে ছেলেদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল। হেডমাষ্টার আবার বললেন, তোমরা সবাই আমার কথা শোনো—তাহলেই সব বুঝতে পারবে। আমি তোমাদের পাঠিয়েছিলুম আমার হারানো আংটি খুঁজতে। আমাদের বোকচন্দ্র তো তা এনেছেই, আর তার চাইতে দামী জিনিস খুজে পেয়েছে—সে হচ্ছে হারানো রতন।

ছেলের দল পরস্পর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

হেডমাষ্টার মশাই বললেন, তোমরা এখনো আমার কথা ঠিক বুঝতে পারো নি। তবে শোনো। ভগবান আমাদের সকলের বুকে অমূল্য রতন দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে রতন হচ্ছে—দয়া, মায়া, পরোপকার—এই সব প্রবৃত্তি। কিন্তু আমরা নিজেদের দোষে এই সব অমূল্য রতন হারিয়ে বসে থাকি। আমার বোকা ছাত্রটি একটি গোরুর প্রাণ রক্ষা করে দয়ার পরিচয়

দিয়েছে, আর মাঝির ছেলেকে নিজের চাদর বিলিয়ে দিয়ে পরো-পকার প্রবৃত্তিকে খুঁজে পেয়েছে। ও যদি আজ আমার আংটি ফিরে নাও পেতো তবু আমার ক্ষোভ ছিল না। কেননা ও আজ সত্যিকারের হারানো রতন খুঁজে পেয়েছে। আমার স্কুলের সব ছাত্র যেদিন এমনি করে হারানো রতন পাবে—সেই দিনই আমি হবো সার্থক শিক্ষক।

ছেলের দল হেডমাষ্টার মশায়ের এই কথা শুনে সব ঝগড়াঝাটি ভুলে, এমনকি হাত পায়েব সমস্ত ব্যথা ভুলে গিয়ে, বোকচন্দ্রের জয়ধ্বনি করে উঠল।

এর পর যথাকালে পুরস্কার-বিতরণীর দিন এল। হেডমাষ্টার মশাই বোকচন্দ্রের হাতে বিশেষ পুরস্কার দিয়ে উপস্থিত সকলকে সব কথা খুলে বললেন। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

বোকচন্দ্র আনন্দে চোখ বুঁজে, মাথা নিচু কবে মনে মনে বললে, আজ আমার জীবন সার্থক!

শঙ্কররামের সঙ্কট

শঙ্কররাম সেই ছোটবেলা থেকে সঙ্কট বাঁধাতে ওস্তাদ। ইস্কুলের প্রতি বছর যখন পরীক্ষা এগিয়ে আসতো, এই শঙ্কররাম হয় গাছ থেকে পাখির বাসা চুরি করতে গিয়ে হড়কে পড়ে পা ভাঙতো, নয়তো শেষ মুহূর্তে রাত জেগে এত বেশি পড়াশুনা শুরু করে দিত যে, পরীক্ষার কয়েক দিন আগে বেদম জ্বর। স্পোর্টের মাঠে উঁচু-লাফ খেতে গিয়ে কতবার যে মুখ থুবড়ে পড়ে সামনের দাঁত ভেঙেছে তার আর লেখাজোখা নেই। তারপর ঢাল জল, আন ডাক্তার, নিয়ে চল হাসপাতালে—ছেলেদের হ্যাঙ্গাম হুজ্জুতের শেষ নেই।

সেবার এক বিয়ের ব্যাপারে শঙ্কররামকে দেওয়া হল ডাল পরিবেশন করতে। সে এমন কাজের ছেলে যে স্বয়ং বরকর্তার মাথার ওপরেই ডালের গামলা ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। তখন বিয়ে ভেঙে যায় আর কি! পাড়ার মাতব্বরেরা অনেক হাতে-পায়ে ধরে বরকর্তাকে স্নান করিয়ে তবে ঠাণ্ডা করে। নইলে এই ডাল পরিবেশন করার কাজেই বিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল! এমনি সঙ্কট বাঁধাতে শঙ্কররাম ওস্তাদ একেবারে।

আর একবারের কথা ভাবলে পাড়ার লোক এখনো শিউরে ওঠে। হরিপদর বুড়ি পিসি অর্ধোদয়-যোগে গঙ্গাস্নানে যাবে। কিন্তু তাকে নিয়ে যাবার কেউ নেই। হরিপদ ছেলেমানুষ। সে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলবে। বুড়ি পিসিকে আগলাবে কী করে? পাড়ার সব নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। গোবর্ধনের মুদিদোকান, হরেকেষ্টর হরিসভা, ত্রৈলোক্যনারায়ণের ভেলি-গুড়ের ব্যবসা, জগবন্ধুর ইটের ভাটা—কাজেই লোক আর পাওয়া

যায় না। শেষকালে পাড়ার মাতব্বরেরা বললে, তা আমাদের শঙ্কররামই যাক না। বুড়িকে একটু গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতে পারবে না! মহা উৎসাহে শঙ্কররাম হরিপদর বুড়ি পিসিকে নিয়ে রওনা হল। কিন্তু স্নান করানোর এক ধাপ উঁচুতে গিয়ে এমন করে চুবিয়ে দিল বুড়িকে যে, তার প্রাণপাখি তখনি বুঝি খাঁচাছাড়া হয়ে যায়। শেষকালে এক স্বেচ্ছাসেবক শঙ্কররামের কাণ্ড দেখে ছুটে আসে,—আর কোনো রকমে সদ্য গঙ্গাপ্রাপ্তি থেকে বুড়িকে রক্ষা করে।

এহেন শঙ্কররাম প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়ে হঠাৎ কলকাতায় চলে এলো। একটা ছবি আঁকার ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেল, সে নাকি ঠিক করেছে আর্টিস্ট হবে।

শেষ পর্যন্ত ছবি আঁকা শেখা আর তার হল না, কিন্তু একটা কাজ সে মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলল।

সেটি হচ্ছে—চমৎকার টাইপ লেখা, দিনরাত মক্স করে করে হাতের লেখা ভারি সুন্দব করে তুলেছিল। কাজেই টাইপ তার হাতে খুব ভাল লেখা হত।

এর পর চললো চাকরির জন্যে হাঁটাহাঁটি আর ঘোরাঘুরি। এমন অফিস নেই যেখানে এরপর হানা না দিয়েছে, কিন্তু টাইপ লেখানোর প্রয়োজন সকলের থাকে না। কাজেই ক্রমাগত জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে যেতে লাগলো ; কিন্তু অল্প মাইনের চাকরিও আর কপালে জুটল না।

হঠাৎ এরই মধ্যে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল, কোনো দৈনিক কাগজের দরকার হল টাইপ লেখানোর। যখনি কোনো বড় কিংবা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে, তখন আর প্রেসের টাইপে কুলোয় না, বড় বড় টাইপ লিখে ব্লক করে ছাপতে হয়—যাতে পাঠকের চোখ সেই দিকে পড়ে। কাগজের কর্তা সেইরকমই একজন

খুঁজছিলেন, হাতের কাছে হঠাৎ পেয়ে গেলেন শঙ্কররামকে, শঙ্কররামও বর্তে গেলো নতুন চাকরি পেয়ে। হরেক রকম টাইপ তাকে বসে লিখতে হয়। কখনো লেখে—"জাপানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দশ লক্ষ লোকের জীবন-হানি" কখনো লেখে "গৌরী-শঙ্করের শিখরে ভারতীয় বীর তেনজিং" আবার কখনো অক্ষর সাজায় "পরলোকে দানবীর বিশ্ববন্ধু ত্রিবেদী"।

প্রত্যহ নানারকম ফরমাস আসে তার কাছে। লেখো—'আমেরিকায় নববর্ষ-উৎসবের উন্মত্ততায় বিশহাজার লোক আহত', সাজিয়ে ফেল—'পণ্ডিত নেহেরুর পঞ্চশীল প্রস্তাবেই বিশ্বশান্তি নিহিত আছে', বড় বড় হরফে লেখো—'সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আগমনে ভারতে জন-সমুদ্র সৃষ্টি!'

আবার কখনও লিখতে হয়—'অমর কবি শুভসুন্দরের অকালে জীবনাবসান!'

এইভাবে নানাবিধ বিষয়ে লিখতে লিখতে তার মনে একটা বিরাট প্রশ্ন জাগল। তাইতো! সেদিনে কেবলই অপরের মৃত্যু-সংবাদ টাইপে লিখেছে—হাজার হাজার পাঠক তার সে টাইপ দেখে সে খবর জানতে পারছে, কিন্তু একদিন সেও তো পটল তুলতে পারে—তখন তার মৃত্যুসংবাদ টাইপে কে লিখে দেবে?

এই কথা ভেবে ভেবে শঙ্কররামের দু'চোখে আর ঘুম নেই। তাইতো! এই জরুরি কথাটা সে তো একবারও ভেবে দেখেনি! আজকাল যে রকম মরার হিড়িক লেগেছে, তাতে ভয় পাবার কথা তো বটেই! যমরাজার দুয়োরে গিয়ে হাজির হচ্ছে, ভেজাল খাবার খেয়ে পটল তুলছে, টেবিলে কাজ করতে করতে পরলোকের পরোয়ানা পাচ্ছে, সভা সমিতিতে বক্তৃতা করতে করতে পঞ্চভূতে মিশে যাচ্ছে..........না না, এ সব তো মোটেই

ভালো লক্ষণ নয়! হয়তো একদিন সকালে উঠে হঠাৎ শঙ্কররাম আবিষ্কার করবে যে, তার দেহে আর প্রাণ নেই!

উঃ! অসহ্য এই চিন্তা!

খাওয়াতে রুচি নেই, ডাইংক্লিনিং থেকে আনা ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে আরাম নেই, সিনেমা দেখতে বসলে কেবলই

হাই উঠতে থাকে, দেশ-ভ্রমণের নামে শিউরে উঠে। শঙ্কররামের এ কী অবস্থা হল? ওর মৃত্যুর পর বড় বড় হরফে কি কোন কাগজে বেরুবে না—'পরলোকে অক্ষর-শিল্পী শঙ্কররাম কাঞ্জিলাল!'

অনেক ভেবে শঙ্কররাম এক উপায় আবিষ্কার করল। সেই আবিষ্কারের আনন্দে সে আপন মনেই হাসতে লাগল। মৃত্যুর পর খবরের কাগজেই যদি নাম না উঠলো তবে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র!

সম্প্রতি সে খবরের কাগজে পড়েছে—এক ফাঁসির আসামীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—তোমার অন্তিম কামনা কী বলো? তার উত্তরে ফাঁসির আসামী জানিয়েছিল—মৃত্যুর পর যেন তার নাম খবরেব কাগজে ছাপা হয়। এই তো জীবনের চরম এবং পরম কামনা!

সে চমৎকার টাইপ লিখে ফেললে—"পরলোকে অক্ষরশিল্পী শঙ্কররাম কাঞ্জিলাল।" তাবপর অন্যান্য লেখার সঙ্গে কায়দা করে সেটাও ব্লক করতে পাঠিয়ে দিল। যে করেই হোক মরণের আগেই সে শোক-সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করে যাবে—অনেকে তো নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে যায়। সেটা যদি সম্ভব তবে তার অন্তিম কামনাই বা পূর্ণ হবে না কেন?

রাত্রিবেলা অন্যান্য ব্লকগুলির সঙ্গে "পরলোকে অক্ষরশিল্পী কাঞ্জিলাল"—এই সন্দেশটি পেয়ে কাগজের মালিক তো চক্ষু ছানাবড়া করে ফেললেন—কী সর্বনাশ? এ টাইপ তোমায় কে লিখতে বললে?

অসীম বিনয়ে শঙ্কররাম উত্তর দিলে—আজ্ঞে হঠাৎ একদিন তো আমরাও যাবো, তাই পাছে আপনার অসুবিধা হয় তাই আগে থেকেই কাজটা সেরে রাখলাম।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন কর্তা। বললেন, বটে? তুমি কাজ সেরে রেখেছ? বেশ! আমি কাল সকালের কাগজেই এই ব্লক ছাপবো। যে করেই হোক আজ রাত্তিরের মধ্যেই তোমায় পটল তুলতেই হবে।

শঙ্কররাম উত্তর দিলে—আজ্ঞে সে কী করে হবে স্যর ? কাল যে আমার এক বন্ধুর বৌভাতের নিমন্ত্রণ ? আজ আমি কী করে পটল তুমি ?

কাগজের কর্তা ওর নাকের কাছে আঙুল নেড়ে বললেন, কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। কাল সকালের কাগজে এই ব্লক ছাপা হবে। এখন বেছে নাও, কী তুমি চাও—বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ, কিংবা পরলোকের সংবাদ প্রকাশ ? ভেবে দেখ ভালো করে—জ্বলজ্বলে অক্ষরে ছাপা হয়ে হাজার হাজার কাগজ বেরুবে—"পরলোকে অক্ষরশিল্পী শঙ্কররাম কাঞ্জিলাল।"

এ প্রলোভন ছাড়া বড় সোজা নয় ! তাই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছে শঙ্কররাম কাঞ্জিলাল।

শঙ্কররামের এই সঙ্কটে তোমরা কি কেউ তাকে সদুপদেশ দেবেনা ? যদি কিছু বলার থাকে তবে সরাসরি আমাকে লিখে পাঠাও।

সারারাত শঙ্কররাম জেগে বসে আছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কথাটা ভুলো না কেউ।

বৈদ্যনাথের ব্যবসা

সত্যি বৈদ্যনাথ বিপদেই পড়েছে। আগাছা গাঁয়ের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-সচিব সে। একটা দারুণ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করিয়ে দিয়ে মাঝপথে যদি ফুটবল ফেটে যায়—তবে ক্রীড়া-সচিবের কী দুর্গতি হয়—সে কথাই সহজেই অনুমান করা যেতে পারে! এ তো আর কলকাতার শহর নয় যে চট্ করে আর-একটা ফুটবল কিনে মাঠে ফেলে দেবে! অজ পাড়াগাঁয়ে একটি ফুটবল জোগাড় করা যে কী শক্ত সে কথা বৈদ্যনাথ ছাড়া আর কে বেশি জানে? বহুদিন ধরে ছেলেরা মিলে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে এই ফুটবলটা কিনেছিল। তিনটে ম্যাচ খেলার পরই সেটা এমনভাবে ফেটে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে —সে কথা কে ভেবেছিল!

আগাছা গাঁয়ের ছেলেরা বললে, এক কাজ করো বৈদ্যনাথ, গাছ থেকে বাতাবি পেড়ে নিয়ে এসো তাই দিয়েই ম্যাচ চলুক। বৈদ্যনাথ ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলে, দূর দূর! তাহলে পাশের গাঁয়ের ছেলেদের কাছে কি আর মুখ থাকবে? এমনিতেই তো আগাছা গাঁয়ের নামে ওরা কত ছড়া বেঁধেছে,—এরপর আমরাই প্রতিযোগিতা শুরু করে যদি বাতাবি লেবু দিয়ে ফুটবল খেলতে ওদের ডাকি—তবে আর কোনমতে মুখ দেখাতে পারবো না। আগাছা গাঁয়ের নিন্দেয় একেবারে চারিদিকে ঢি-ঢি পড়ে যাবে।

—তাহলে উপায়?

ঠোঁট কামড়ে বৈদ্যনাথ উত্তর দিলে, আবার গোটা গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে ফুটবল কিনে নিতে হবে।

ছেলেরা ভয়ে-ভয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকায়।

একজন বেশ খানিকটা সাহস এনে বললে, কিন্তু আমাদের এই গাঁয়ে চাঁদা কি কেউ দেবে?

বৈদ্যনাথ বললে, সবাইকার কাছে যেতে হবে। কেউ কম দেবে, কেউ বেশি দেবে। দেখিস নি তোরা, আমাদের ম্যাচের সময় মাঠে কত ভিড় হয়! খেলা দেখবার যখন এত উৎসাহ, তখন চাঁদা নিশ্চয়ই মিলবে।

তার পরদিন থেকে বৈদ্যনাথের পরামর্শে ছেলেরা গ্রামের সব বাড়িতে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল।

কেউ গেল মুখুজ্জে-বাড়ি, কেউ গেল দত্ত-বাড়ি, কেউ হাজির হল মিত্তির-বাড়ি, আবার কেউ বা ঢুঁ মারল গুপ্ত-বাড়ি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—একটা ব্যাপারে বাড়ির কর্তারা সবাই একমত। সবাই প্রায় মারমুখো হয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে।

—হুঁ! চাঁদা দেবে? ওই ফুটবল খেলে—জামা-কাপড় ছিঁড়ে কী লাভ হবে বাপু শুনি? আজকাল জামা-কাপড়ের দর কত চড়ে গেছে—সে খবর রাখিস তোরা?

ভট্‌চাজ মশাই নাকের ওপর থেকে চশমাটা কপালের ওপর তুলে প্রশ্ন করলে, আর বৎসগণ, ওই চর্ম-গোলক পদাঘাতে বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে কার উপকার হবে—আমায় জ্ঞাপন করতে পারো?

এই জাতীয় বাঙলা শুনে ছেলেরা পালাতে পথ পায় না।

গ্রামের মাতব্বরদের রকম-সকম দেখে ছেলেরা কিন্তু ভারি দমে গেল!

কাণ্ঠু বল্লে, এক পয়সা চাঁদা দেবেনা কেউ—

মণ্ডা ফোঁড়ন দিয়ে মন্তব্য করলে, মিছিমিছি ওদের পেছনে ছোটা। তার চাইতে বাতাবি লেবু অনেক ভালো—

বৈদ্যনাথ সবাইকে থামিয়ে দিয়ে উত্তর করলে, চুপ কর তোরা। আমার মাথায় চমৎকার একটা প্ল্যান এসেছে—

নতুন প্ল্যানের নামে সবাই হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল।

—কী প্ল্যান শুনি ?

—আমরা ব্যবসা করবো। ব্যবসা করে টাকা জমিয়ে, সেই টাকা দিয়ে ফুটবল কিনবো—

ছেলের দল আগে যেমন উৎসাহ করে এগিয়ে এসেছিল— বৈদ্যনাথের এই ব্যবসার কথা শুনে তেমনি হতাশ হয়ে বসে পড়ল।

—অ্যাঁ! তোরা হতাশ হয়ে একেবারে বসে পড়লি যে! কিন্তু এ ব্যবসাতে খুব অল্পদিনের ভেতর টাকা উঠে আসবে। শোন তবে বলি—

বৈদ্যনাথ আবার ভালো হয়ে গুছিয়ে বসল। ছেলের দলও আবার নতুন প্রেরণা পেয়ে এগিয়ে এলো।

বৈদ্যনাথ বললে, শোন, আমরা ইস্কুলে একটা ফলের দোকান খুলি আয়। শশা, কলা, পেঁপে, আক, বাতাবিলেবু এইসব বিক্রী করবো। ছেলেদেব সবাইকে বলে দেবো, তারা যেন এই দোকান থেকে টিফিন কেনে। তা'হলেই আমাদের এক মাসে অনেক টাকা উঠে আসবে।

মণ্ডা মন্তব্য করলে, হুঁ! তা তো বুঝলাম! কিন্তু এই ফলগুলি কোথায় মিলবে শুনি ?

কাণ্ঠু বললে, কিনে এনে বিক্রী করতে গেলে, তার থেকে কিছু হয়ত পচে যাবে, কিছুর দাম আদায় হবে না।

বৈদ্যনাথ উত্তর দিলে, দূর পাগ্‌লা! তা কেন? আমরা মিছিমিছি কিনে ফল আনতে যাবো কোন ? আমাদের গাঁয়ের যে-সব মোড়ল চাঁদা দেয়নি, তাদের বাগান থেকেই জোগাড় করতে হবে জিনিসগুলি—। এই যেমন ধর না মুখুজ্জে-বাড়ির পেঁপে,

দত্ত-বাড়ির শশা, মিত্তির-বাড়ির বাতাবি লেবু, গুপ্ত-বাড়ির আক—এমনিভাবে যদি আমরা রাতের অন্ধকারে নষ্টচন্দ্রের ব্যবস্থা করি—তাহলেই তো আমাদের বিনা মূলধনে ব্যবসা হ'ল—

বৈদ্যনাথের ব্যবসাবুদ্ধি দেখে ছেলেদের তাক্ লেগে গেল! সবাই আনন্দধ্বনিতে এই প্রস্তাব সমর্থন করল।

পরদিন থেকেই শুরু হল—বৈদ্যনাথদের অভিযান। তার আগেই ইস্কুলের ফটকে আর বিভিন্ন দিকের বেড়ায় ওরা পোস্টার লাগিয়ে দিলে—

আগাছা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের
ছাত্রগণ পরিচালিত অভিনব
"টাটকা ফলের দোকান"
টিফিনে সবাই ফল খেয়ে দেহকে পুষ্ট করো—তা'হলেই খেলায়
জিততে পারবে।

এই পোস্টার পড়ে ছেলেদের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। সত্যি কথাই তো! টাটকা ফল না খেলে কখনো শরীর পুষ্ট হয়? ভিটামিন খেতে হবে—ভিটামিন! ছেলেরা নিজ-নিজ ক্লাশে দারুণ প্রচার-কার্য চালালে।

ফলে প্রথম দিন থেকেই ফলের দোকানে প্রচুর ভিড়। টিফিনের পর কাঠের বাক্সের পয়সা গুণে বৈদ্যনাথ বললে, বৌনিটা হয়েছে ভালো। প্রথম দিনেই একটাকা সাড়ে তিনআনা।

ইস্কুলের উঠোনের ওপর একটা বড় অশথ্ গাছ আছে। তারই নিচে ছেলেরা গোটাকয়েক কেরোসিন কাঠের বাক্স জোড়া দিয়ে চমৎকার ফলের দোকান খুলে ফেলেছে। কাঠের বাক্সের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে কলাপাতা। তার ওপর সাজিয়ে রেখেছে পেঁপে, শশা, কলা, আক, বাতাবি লেবু, শাঁকালু...এই সব। শশা

আর বাতাবি লেবু খাবার জন্যে আবার টিফিনের কৌটোতে রয়েছে নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো! অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটিই নেই!

টিফিনের ঘণ্টায় গোটা ইস্কুলের ছেলেদের এইখানে ভিড় জমে যায়। স্পোর্টস্ বিভাগের ছেলেরা দু'হাতে টাট্‌কা ফল সরবরাহ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

বৈদ্যনাথ এক সময় ফিস্‌ফিস্ করে বললে, মাষ্টার মশাইদেরও হাতে রাখা দরকার। হেড স্যর থেকে শুরু করে সবাইকে কিছু কিছু ফল পাঠিয়ে দে তোরা। একমাস পরে গিয়ে চাঁদার জন্যে ধরবো। তখন আর লজ্জায় কেউ না বলতে পারবে না।

ছেলেরা বললে, ঠিক! ঠিক! হেড স্যর যদি দু'টাকা চাঁদা দেন তবে অন্য সব স্যরেরাও একটাকা করে না দিয়ে পারবেন না।

বৈদ্যনাথ এখন গর্বে ফুলে উঠেছে। মাথা দুলিয়ে মন্তব্য করলে, দেখলি তো এখন! বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। গোটা গাঁ ঘুরে চাঁদা আদায়ে যা হত—তার চতুর্গুণ হবে এই ফলের ব্যবসা করে।

মণ্ডা ভয়ে ভয়ে বললে, কিন্তু এইভাবে ফল যে কতদিন সংগ্রহ করা যাবে—সে-ই হচ্ছে মস্ত বড় ভাবনার কথা!

বৈদ্যনাথ গলা খাটো করে শুধালো, কেন রে, কেউ কিছু টের পেয়েছে নাকি?

কাঠু উত্তর দিলে, টের হয়ত এখনো পায়নি, কিন্তু পেলে তখন? এইভাবে ক'দিন গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে আনা চলবে?

আর একটি ছেলে ছড়া কাটলে—

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে—
যদি না পড়ে ধরা—

ধরা পড়লেই মরা!

বৈদ্যনাথ বিজ্ঞের মতো উত্তর দিলে, আরে ভাই, ব্যবসার কলাকৌশল শিখে নিতে পারলে আর কোনো ভয় থাকবে না। একটা ব্যবসাকে চালু করা কি সহজ কথা?

ছেলেরা মাথা নেড়ে সায় দিলে, তা সত্যি! তা সত্যি!

টাটকা ফলের দোকান চলতে লাগলো!

মাষ্টারমশাইরা আগে টিফিনের ঘণ্টায় কেউ চা, কেউ মুড়ি, কেউ বা বাড়ি থেকে আনা শুকনো রুটি চিবুতেন। এখন তাঁরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে টাটকা ফল খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন

সত্যি, ছেলেদের বাহাদুরি দিতে হয়। বেশ সস্তায় ওরা সুন্দর টাটকা ফল সরবরাহ করছে। হেড স্যর অবধি বলেছেন যে, এই দোকানের জন্যে ইস্কুল থেকে একটা গ্র্যাণ্টের ব্যবস্থা করে দেবেন।

এই ঘটনার দিন-তিনেক পরের কথা।

টিফিনের ঘণ্টা পড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলের দল এসে ভিড় করল সেই অশথ্ গাছের তলায়।

সবাইকার ফল খাওয়া চলতে লাগলো বিপুল উদ্যমে। কেউ বলছে, শশার সঙ্গে আর-একটু মরিচের গুঁড়ো দাও—কেউ চিৎকার করছে, আজকের পেঁপেটি ভারী মিষ্টি, আরো দু'ফালি আমায় কেটে দাও—আবার আর-একজন বলছে, আকটা আগে কেটে ফেলো না ভাই! এর পর টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে গেলে চিবুবো কখন?

এমনিতর নানাবিধ কথায় অশথ্তলা যখন গমগম করছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল—হেড স্যারকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিকে আসছেন—গ্রামের মুখুজ্জে মশাই, দত্ত মশাই, মিত্তির মশাই—আর গুপ্ত মশাই। সরাসরি তারা এসে হাজির হলেন টাটকা ফলের দোকানে।

মুখুজ্জে মশাই লাঠি উঁচিয়ে বললেন, এই দেখুন হেড্মাষ্টার মশাই আমার বাড়ির পেঁপে। হাজারটা পেঁপের মধ্যে মিশিয়ে দিলেও আমি ঠিক চিনে বের করতে পারবো। দত্ত মশাই লাফিয়ে উঠে, আর আমার শশা? এই দেখুন, কাল রাত্তিরে আমি নিজের হাতে চুনের দাগ দিয়ে রেখেছিলাম!

মিত্তির মশাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, আমার বাগানের মত এত বড় বাতাবি লেবু গাঁয়ে আর কোথাও হয় না। আপনাকেও তো

কতদিন খাইয়েছি হেডমাষ্টার মশাই। এর স্বাদ একেবারে আলাদা।

গুপ্ত মশাই দেখলেন সবাই সকলকার কথা বলে নিলে, তিনিই শুধু পেছনে পড়ে রইলেন। এইবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একখণ্ড আক তুলে নিয়ে হেডমাষ্টার মশায়ের নাকের সামনে একবার ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, দেখুন স্যর দেখুন—এ আমার ক্ষেতের আক! দু'দিনেই ছেলেরা সমস্ত আক কেটে নিয়ে এসেছে। আমার একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছে! এই বলে সেই আক তুলে নিয়ে দমাদ্দম মারলেন বৈদ্যনাথের পিঠে—তারপর যে কী কাণ্ড শুরু হল—তা লিখে বোঝানো যাবে না। দোকানের পৃষ্ঠপোষকগণ সবাই এক সঙ্গে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। বৈদ্যনাথ নিজে দোকান আর ক্যাশবাক্স আগলে ছিল, তাই সে-ই ধরা পড়লো।

অতঃপর হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে—নাক মলা, কান মলা, নাকে খৎ, নাড়ুগোপাল হওয়া—সে অনেক কিছু ব্যাপার।

গোটা গাঁয়ের ওপর একেবারে হাড়ে চটে গেল বৈদ্যনাথ। রাগ করে পরদিন থেকে আর ইস্কুলেই এলো না। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলো, সাধে কি আর বাঙালী ব্যবসাতে সবাই-কার পেছনে পড়ে আছে? এরা হচ্ছে একেবারে কলমপেসা কেরাণীর জাত! আরে ছোঃ!

ঘেন্নায় আর বৈদ্যনাথ কলম ধরলো না।

কান-কথার কেরামতি

এক বাদশা তাঁর বিদূষকের ওপর একদিন ভারী চটে গিয়ে বললেন, যাও, আজ থেকে তোমার দানা-পানি বন্ধ। তুমি আর বাদশাহী তহবিল থেকে এক পয়সাও পাবে না।

বিদূষক হাত জোড় করে বললে, হুজুর মা-বাপ। আমার মাসিক বরাদ্দ আপনি বন্ধ করে দিলেন! কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তো আমি বড় বিপদে পড়ব! বাদশার কাছে আমার শুধু একটা আরজি আছে।

তখনকার দিনে বাদশারা ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট হতেন। তাই আলবোলায় একটা সুখটান দিয়ে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, কী তোমার আরজি আছে, পেশ করো—

বিদূষক হাত জোড় করেই আছে। এইবার শিরটাকেও আর একটু নুইয়ে দিলে। করুণ কণ্ঠে বললে, হুজুর, আমাকে শুধু এই অনুমতি দিন যে, দরবার চলা কালে আমি যেন মাঝে-মাঝে আপনার সিংহাসনের কাছে যেতে পারি আব আপনার কানে-কানে কিছু বলছি—এই রকম ভাব দেখাতে পারি।

ওর এই প্রস্তাবে বাদশা ভারী কৌতুক বোধ করলেন। তাই বললেন, সে কী হে, আমার কানে-কানে কথা বললেই তোমার পেট ভরবে?

বিদূষক করুণ কণ্ঠে আবার আবেদন জানালে, হুজুর মা-বাপ। শুধু এইটুকু অনুমতি দিলেই আমি খুশি। বাদশার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো, এ কি আমার সোজা সম্মান?

ইতিমধ্যে বাদশার মন নরম হয়ে এসেছে। তিনি খোস-মেজাজে আর একবার আলবোলা টেনে বললেন, বহুৎ আচ্ছা! বিদূষক তখন মাটি পর্যন্ত মাথাটি নুইয়ে দিয়ে বাদশাকে কুর্নিশ করে ঘরে ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে বিদূষকের চাকরী যাবার কথা তার বিবির কাছে পৌঁছে গেছে। বাড়ি ফিরে যেতে বিদূষকের বিবি তাকে এই মারে তো এই মারে।

বিদূষক তখন তার বিবিকে বোঝালে—আরে, তুই মিছিমিছি চটছিস কেন? চাকরী আমার গেছে বটে, কিন্তু উপার্জন এখন বেড়ে যাবে হাজার গুণ!

বিবি শুধোলে, সেটা কী রকম করে হবে শুনি? এদিকে বাদশাকে চটিয়ে তোর চাকরী চলে গেল, আবার বলছিস উপার্জন যাবে বেড়ে? আমাকে কি বোকা বোঝাচ্ছিস নাকি?

বিদূষক জবাব দিলে, আরে, আগে আমার কথা শোন্। আমি একটি কথাও মিছে বলিনি, কি বানিয়ে বলিনি। কাল থেকেই দেখতে পাবি আমি রোজ কীরকম টাকা ঘরে নিয়ে আসি। ইচ্ছে করলে এখন থেকে তুই প্রচুর গয়না গড়াতে পারবি।

এই কথা শুনে ফোঁস করে উঠল বিদূষকের বিবি। হুঁ! বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে না খেতে পেরে এখন পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। গয়না গড়াবে! মস্করা করবার আর জায়গা পাসনি মিন্‌সে! মিছিমিছি বাদশাকে চটিয়ে দিয়ে চাকরীটা খোয়ালি তুই! এখন আমাদের কী উপায় হবে শুনি?

বিদূষকের বিবি চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে বসল। বিদূষক তখন তাকে বোঝাচ্ছে, আরে বোকা মেয়ে, তুই যে একেবারে কাঁদতে বসে গেলি! দেখ্ না, কাল থেকে আমি কী খেল্‌টা দেখাই—

বিবি বললে, আর খেল্ দেখাতে গেলে গর্দানা যাবে তোর!

বিদূষক মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলো তার কথা শুনে।

পরদিন দরবার বসলে পর বিদূষকের বিবি কেবলই ঘর-বার করতে লাগলো। কী জানি, কাল চাকরী গেছে,—আজ আবার কী দুঃসংবাদ আসে!

দরবার ভেঙে যাবার ঘণ্টা বেজে গেল—তবু বিদূষকের বাড়ি ফিরে আসবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

বিদূষকের বিবি তখন কেঁদে-কেটে অস্থির। তার কান্নার শব্দে প্রতিবেশীরা সব এসে জড় হল। সবাই প্রশ্ন করে, কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?

আমার খসম বুঝি আর নেই গো ! বাদ্‌শার হুকুমে তার বুঝি গর্দানা গেছে !

বিদূষককে তার রসিকতার জন্য পাড়ার সবাই ভালো-বাসতো। এই দুঃসংবাদ শুনে প্রতিবেশীরা সকলেই একযোগে মড়া-কান্না শুরু করে দিলে। যে ছুটে আসে সে-ই কান্নায় যোগ দেয়। কেউ আর কাউকে কোনো প্রশ্ন করে না।

এমনি ভাবে যখন বাড়ির সামনে বিরাট বাহিনী বসে গেল, তখন, দূরে দেখা গেল—বিদূষক হেলতে-দুলতে ফিরে আসছে—হাতে তার এক মস্ত থলি।

সে তো তার বাড়িব সামনে এই কান্নাকাটি শুনে একেবারে থ' মেরে গেল ! ভাবলে, তার বিবির কিছু হয়েছে হয়ত !

সেও এসে সবাইকার সঙ্গে মড়া-কান্নায় যোগ দিলে। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর হয়রাণ হয়ে সে তার পাশে-বসা একজন প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ হে দোস্ত, কী হয়েছে বলো তো ?

দোস্ত মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, আমি তো কিছু জানি না ভাই ! সবাই কাঁদছে, তাই আমিও কাঁদতে লেগে গেছি। ওদিকে অন্দর-মহলে এতক্ষণ কান্নাকাটির পর বিদূষকের বিবি ভাবলে, তাইতো, সত্যি যদি গর্দানা গিয়ে থাকে তাহলে তো বিদূষকের লাস বাড়িতে এনে কবরের ব্যবস্থা করতে হয় !

আর বিদূষক এতক্ষণ ধরে বাড়ির সামনে চোখের জল ফেলার

পর চিন্তা করলে, বিবি যদি তার সত্যি মরে গিয়ে থাকে তাহলে তো দোস্তদের ডেকে কবরের আয়োজন করতে হবে।

দুইজনে একই সময়ে একই কথা ভেবে—বিবি বেরিয়ে আসছে বাড়ির বাইরের দিকে, আর বিদূষক ঢুকছে বাড়ির ভেতর। সদর দরজার মুখে দু'জনের মুখোমুখি।

ও বলে,—তুমি!

এ বলে,—তুমি!

তারপর দু'জনেরই কান্না-ভেজা চোখে হাসি ফুটে উঠল।

বিদূষক তার থলেটা দেখিয়ে বললে, এই দেখ, এক দিনে হাজার আসরফী রোজগার করেছি!

বিবি বললে, তাহলে এতক্ষণ ধরে প্রতিবেশীরা যারা কাঁদছিল, তাদের সবাইকে পোলাও-মাংস খাইয়ে দাও।

বিদূষক চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক তুলে, দাঁত বের করে উত্তর দিলে, হুঁ, খুব রাজি।

এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করে প্রতিবেশীদের ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। পোলাও-মাংসের কথা শুনে তাদের মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

এর পর থেকে বিদূষকের আয় খুব বেড়ে গেল। প্রত্যহ দূর দূর অঞ্চল থেকে বাদশার কাছে যারা দরবার করতে আসে বিদূষক তাদের কাউকে বলে—বাদশা আমার কথা খুব শোনেন, তোমার কাজের ব্যবস্থা করে দেবো; কাউকে সলা-পরামর্শ দেয়—তুমি বাদশাকে নজরানা দিতে এসেছ? সব আমার হাতে তুলে দাও। বাদশা নিজের হাতে তো ওসব ছোঁবেন না। আমি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবো। কে তীর্থযাত্রার জন্যে সাহায্য চায়, কে গ্রামের উন্নতির জন্যে ভিক্ষে করতে এসেছে, কে তার সব কিছু সম্পত্তি সৎকাজে ব্যয়ের জন্যে বাদশার পায়ে উপহার দিতে এসেছে —এদের সবাইকার সঙ্গে গোপন পরামর্শ চলে বিদূষকের।

তারপর বাদশা যখন দরবারে বসেন, বিদূষক সকলের সামনে বারে বারে গিয়ে বাদশার সিংহাসন ঘেঁসে দাঁড়ায় আর মাঝে-মাঝে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলে।

সবাই দেখে আর অবাক হয়।

তাই তো! বাদশার সঙ্গে ওর এত দহরম-মহরম! যারা ইতিপূর্বে ওর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে তারা ভাবে,—নিশ্চয়ই ও আমার কথা বাদশাকে ভালো করে বুঝিয়েছে।

এইভাবে ওর পসার দিন-কে-দিন বেড়েই চলে।

এর পর, যতই দিন যেতে লাগলো—দেশের লোক আর আমীর-ওমরাহের সঙ্গে পরামর্শ করে না, উজির-নাজিরের দোরে হাঁটাহাঁটি করে না,—সব ভীড় বিদূষকের বাড়ি। স্বয়ং বাদশার কানে-কানে যে সব সময় পরামর্শ দেয় তাকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

আরো কিছুকাল পরে বাদশা হঠাৎ জানতে চাইলেন, বিদূষকের দিন চলছে কী করে?

বিদূষক তখন একটা লম্বা কুর্নিশ করে জবাব দিল, হুজুর, বাদশার সঙ্গে যে কান-কথা কয় তার দিন কি খারাপ যেতে পারে? বাদশার দৌলতে আজ আমি সুখেই আছি।

বাদশা অবাক হয়ে শুধোলেন, সে কী করে সম্ভব? তুমি তো এক পয়সা মাইনে পাও না!

বিদূষক আবার সাত সেলাম জানিয়ে উত্তর দিলে, হুজুর, বাদশার সঙ্গে কান-কথা বলার দাম মাইনের চাইতে হাজার গুণ বেশি।

শুনে বাদশা খুশি হয়ে বললেন, আচ্ছা, আবার আমি তোমায় চাকরী দিচ্ছি—

বিদূষক সবিনয়ে উত্তর দিল, গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর! আমি শুধু বাদশার সঙ্গে কান-কথাই কইতে চাই, চাকরী চাই নে।

স্বাধীনতার মজা

ময়দানে স্বাধীনতা-উৎসবের সমবেত ব্যায়ামে যোগদান করে ফিরে এসেই বিচ্ছু সবাইকে ডেকে বোঝাচ্ছে স্বাধীনতার কী মূল্য।

ঝিকে বোঝাচ্ছে, চাকরকে বোঝাচ্ছে, মাকে, পিসিকে—ভালো করে মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে।

—এই ধর না কেন, দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন সব ক্ষমতা নিজেদের হাতে আসে। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন, তাই ভারতবর্ষের লোকই দেশকে শাসন করছে। সবাইকে স্বাধীনতা দিয়ে দিতে হবে তো? এই, আমার কথাই ধরো না কেন। সব সময় তোমরা বলো,—এই এটা করিসনি, সেটা করিসনি, এখানে যাসনে, ওখানে যাসনে! বৃষ্টিতে ভিজিসনি, রাত করে বাড়ি ফিরিসনে! আচ্ছা, আমাকে তোমরা স্বাধীনতা দিয়ে দাও না কেন?

বিচ্ছুর কথা সবাই শোনে, আর মুচকি মুচকি হাসে। সত্যি কথাই তো! কী অবিচার! বিচ্ছুর স্বাধীনতা নেই! বাড়ির পুরনো চাকর রামদীন শুধোয়, হ্যাঁগো বিচ্ছুবাবু, তোমার স্বাধীনতা কবে হবে ?

গোটা বাড়িতে রামদীনই যা দরদ দিয়ে ওর কথাবার্তা শোনে!

বিচ্ছু আবার বোঝাতে শুরু করে, আচ্ছা তুমিই বলো না রামদীনদা, স্বাধীনতা না পেলে একটা মানুষ কখনো বড়ো হতে পারে? ঐ যে ইস্কুলে কবিতা মুখস্থ করি,

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে?
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়?"

রামদীন মাথা নাড়ে আর বলে, ঠিক কথা! বিচ্ছু তার মনের দুঃখ জানিয়ে বলে, কবে যে একা-একা গড়ের মাঠে খেলা দেখতে যাবো, বৃষ্টিতে ভিজে ম্যাচ দেখবো, ট্রামে বাসে চেপে নিজের জিনিস নিজে কিনে নিয়ে আসবো, অনেক রাত্তিরে ফিরলে কিংবা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লে কেউ বকবে না...... সেই কথাই শুধু আপন মনে ভাবি।

রামদীন এবার ওকে বোঝায়, হবে হবে, আর একটু হাতে পায়ে বড়ো হও, তাহলেই একা-একা সব কিছু নিজের হাতে করতে পারবে।

কিন্তু বিচ্ছুর মনের খুঁত খুঁত ভাব যায় না। সবায়ের কাছে সে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ায়—তার স্বাধীনতা আর হলো না।

বিচ্ছুর স্বাধীনতা নিয়ে সারা বাড়ির লোক ভারি মজা পায়। ঠাট্টার সুরে বলে, আহা বেচারীর ভারী কষ্ট! কবে যে বিচ্ছু স্বাধীনতা পাবে—আমরা সেইজন্য দিন গুনছি।

অবশেষে সারা বাড়ির এই মজাটা বিচ্ছুর জ্যাঠামশাইএর কানে গেলো। তিনি একদিন তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, শোনো বিচ্ছু, তোমার দুঃখের কাহিনী শুনেছি। তাই আমি ঠিক করেছি আসছে কাল সকাল থেকে সন্ধে অবধি তোমায় স্বাধীনতা দেবো। দেখবো কী ভাবে তুমি সারাটা দিন কাটাও।

জ্যাঠামশাইএর শেষ কথাটা শোনবার মতো ধৈর্য বিচ্ছুর ছিল না। সে শুধু জানতে পেরেছে যে একটা দিনের জন্যে সে স্বাধীনতা পেয়েছে। ব্যস। তিড়িং লাফ শুরু হয়ে গেল!

কী মজা! কাল সকালে তার চারধারে আর বিধিনিষেধের বেড়া নেই। কাল সকালে সে ডিগবাজী খাবে, না গলা ছেড়ে

গান গাইবে, না মাথা দিয়ে হাঁটতে শুরু করবে—ভালো করে ঠাওর করতে পারে না।

অতি আনন্দে রাত্তিরে তার ভালো করে ঘুমই হল না। সে সারা রাত টুকরো টুকরো ভাঙা স্বপ্ন দেখতে লাগলো। কখনও স্বপ্ন দেখলো সাঁতরে সে গঙ্গা পার হচ্ছে কখনো দেখলো ঝম্-ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে গড়ের মাঠে ফুটবল খেলায় সে একাই রাশি-রাশি গোল ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিপক্ষের গোল-পোস্টের ভিতর ; এক একটা মজাদার স্বপ্ন দেখে—আর আর ঘুম ভেঙে যায়।

এই ভাবে সারাটা রাত এক দারুণ উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কাটলো। এই একটু ঘুমুচ্ছে আর আবার স্বপ্ন দেখে জেগে উঠছে! সব স্বপ্নেরই 'হিরো' বিচ্ছু স্বয়ং। পরদিন সকালবেলা চোখ কচলে উঠেই মনে হলো যে, তার পায়ের শেকল একেবারে খুলে গেছে! যেখানে খুশি আজ সে যেতে পারবে।

যে কাজটা করা একেবারে ওর বারণ সেইটেই বিচ্ছু আজ সকলের আগে করল। মানে, ওর ছোটকাকার বাইকটা চুপি চুপি বের করে নিয়ে এলো। কলকাতার পথে বাইক চালালো ওর একেবারে নিষেধ। ও সেই কাজটাই আগে বেছে নিলে। ওর বিশেষ বন্ধু হচ্ছে মলয়। বিচ্ছু আগে মলয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল আর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের বেল বাজাতে লাগলো।

বাইরের ঘরে বসে মলয়ের বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওকে দেখেই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হুঙ্কার দিয়ে বললেন—হুঁঃ! সক্কালবেলায়ই আড্ডা? মলয় এখন পড়াশুনো করছে। যাও বাড়ি যাও—

স্বাধীনতা পেয়েই এই ধমক খেয়ে বিচ্ছুর মনমেজাজ ভারী বিগড়ে গেল! ভেবেছিল ছোটকাকুর বাইকে চেপে ক্লাসের সব

বন্ধুদের বাড়ি টহল দিয়ে বেড়াবে। কিন্তু মলয়দের বাড়ি গিয়ে সে যা অভ্যর্থনা পেলো, তাতে তার সব উৎসাহই একেবারে কর্পূরের মত উপে গেল।

সদর রাস্তায় নেমে সে বাইকটাকে একেবারে বন্ বন্ করে চালিয়ে দিলে। এবার আর কোনো বন্ধুব বাড়ি না। হারা উদ্দেশ্যে সে ঘুরে বেড়াবে কলকাতার বিভিন্ন রাজপথে, গঙ্গার ধারে আর গড়ের মাঠের চারধারে চক্কর দিয়ে।

এ রাস্তা দিয়ে চলেছে, ও রাস্তা দিয়ে চলেছে। চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশের নির্দেশ না মেনে বাইক চালিয়ে যেতে পাহারা-ওয়ালাব গালাগাল খেলো। শেষকালে বয়েস নিতান্ত কম বলে দয়া কবে ছেড়ে দিলে তাকে।

এতে বিচ্ছুব মন একেবাবে ভেঙে গেল। তাইতো! স্বাধীনতা পেয়ে যা-খুশি করবে, তা নয়, কিনা পদে পদে শুধু গালাগাল খাচ্ছে!

আরো জোবে বাইক চালিয়ে দিলে বিচ্ছু। শিস দিয়ে বাইক চালিয়ে যেতে লাগলো।

আরো জোরে—আরো জোরে—চালিয়ে দিলে তুই চাকার গাড়ি। আনন্দে সে চোখ বুজলো।

হঠাৎ উল্টোদিক থেকে একটা সোরগোল শোনা গেল।

—ওবে খোকা, পাগলা কুকুর আসছে, পালা—পালা! বহু লোকের চিৎকার একসঙ্গে!

কিন্তু বিচ্ছু একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে ব্রেক কসতে ভুললো।

পড়বি তো পড় একেবারে বাইক-সুদ্ধ সেই পাগলা কুকুরের ঘাড়ের উপর। কুকুরটাও একটা ভীষণ চিৎকার করে বিচ্ছুর পায়ে কামড় বসিয়ে দিলে। ভয়ে, আতঙ্কে আর যন্ত্রণায় বিচ্ছু ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

বিচ্ছুর জ্যাঠামশাইএর এক বন্ধু ওইখান দিয়ে বাজার করে ফিরছিলেন। তিনি ভিড় ঠেলে ছুটে এলেন। তারপর বিচ্ছুকে চিনতে পেরে একটা ট্যাক্সি ডেকে একেবারে সোজা হাসপাতালে। সেখান থেকে একটা টেলিফোন করে দিলেন বিচ্ছুর জ্যাঠামশাইকে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এসে হাজির হলেন বিচ্ছুর জ্যাঠা-মশাই, বাবা-কাকার দল, ঠাকুর, পিসিমা, মা, রামদীন অবধি।

জ্ঞান হতে বিচ্ছু শুধোলে, আমি কোথায় ?

জ্যাঠামশাই রসিকতা করে উত্তর দিলেন, তুমি যে স্বাধীনতা উৎসব করছ! আরো কি স্বাধীনতা চাই ?

বিচ্ছু খানিকটা চুপ করে রইলো। তারপর বললে, না জ্যাঠামশাই, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তোমরা আমার ভালোর জন্যেই আটকে রাখতে চাও। মিছিমিছি আজ আমি মলয়ের বাবার বকুনি খেলাম, পাহারাওয়ালার দাঁতখিচুনি সহ্য করলাম, শেষকালে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাসপাতালে এলাম।

জ্যাঠামশাই মুখ চটকে উত্তর দিলেন, তাতেও তোমার খাওয়া শেষ হয় নি বাপু। এইবার একমাস ধরে ডাক্তারের ইনজেক্শান খাও।

বিচ্ছু ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলে—স্বাধীনতার যে এত সাজা তা আগে কে জানতো!

এত দুঃখের মধ্যেও বাড়ির লোকেরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

তবু ভালো, বিচ্ছুর শিক্ষা হয়েছে।

জন্মদিনে

সত্যেশের বাবা সেদিন সকাল থেকেই একটি জরুরি মোকদ্দমার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। একেবারে যাকে বলে মাথা তোলবার পর্যন্ত সময় ছিল না তাঁর।

এমন সময় একটি অপরিচিত লোক টেবিলের সামনে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালো। নথিপত্র থেকে মাথা না তুলেই বীরেশবাবু প্রশ্ন করলেন, কী চাই? আজ আমি অত্যন্ত ব্যস্ত,—কথা বলবার সময় নেই।

লোকটি কুণ্ঠিতকণ্ঠে উত্তর দিলে, আমার কথাটাও খুব জরুরি, এক মিনিট আপনাকে শুনতেই হবে।

মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল বীরেশবাবুর। তবু তিনি কলমদানিতে কলমটা রেখে দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকালেন।

—আজ্ঞে এই আংটিটা! খোকাবাবু মাসখানেক আগে এইটে আমার দোকানে বন্ধক রেখে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে এসেছিল। বলেছিল খুব শিগ্‌গির ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে।

এইবার বীরেশবাবুর অবাক হবার পালা। ভদ্রলোকটিকে বসতে বলে শুধোলেন, কে? আমার ছেলে সত্যেশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। উত্তর এলো অপরিচিত লোকটির কাছ থেকে।

বীরেশবাবুর মনে প্রশ্ন জাগল—তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন না তো? ঐ হীরে-বসানো আংটিটি সত্যেশের জন্মদিনে তিনি নিজে তাকে উপহার দিয়েছিলেন।

এই আংটিটাকে নিয়ে অনেক কিছু কাণ্ড ঘটে গেছে—সেই জন্মদিনের সন্ধ্যায়।

ছায়া-ছবির মত সমস্ত কিছু বীরেশবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

তাঁর একমাত্র মা-মরা ছেলে সত্যেশের জন্মদিন উৎসব প্রতি বছর তিনি বেশ একটু ঘটা করেই করেন।

এ বছরও সত্যেশ তার ক্লাশের ছেলে আর বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে এনেছিল বাড়িতে। অনেক টাকা খরচ করে একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেছিলেন তিনি, আর নিজে ছেলেকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন এই হীরের আংটি।

তারপর যে ঘটনটি ঘটেছিল—তা' রোমাঞ্চকর উপন্যাসের চাইতেও চাঞ্চল্যকর।

সেইদিন সন্ধ্যার পরই সত্যেশ নিজে আর ছেলের দল এসে বীরেশবাবুর কাছে নালিশ করে যে, তাদের ক্লাশের তরুণ নামে একটি ছেলে সেই হীরের আংটি টেবিলের ওপর থেকে সরিয়েছে।

বীরেশবাবু জাঁদরেল উকিল। অনেক জেরা করলেন সেই তরুণকে। সে হ্যাঁও করে না—না-ও করে না।

শেষকালে অত্যন্ত চটে গিয়ে তিনি তাকে পুলিশে দিয়েছিলেন। যথাসময়ে খবর পেয়েছেন ছেলেটির জেল হয়ে গেছে।

আজ সকালে সেই কাহিনী আবার অন্যদিকে মোড় ফিরেছে দেখে তিনি সত্যি হকচকিয়ে গেলেন।

খবর নিয়ে জানলেন—এই অজানা লোকটি স্যাকরা। সত্যেশ কয়েকটি ছেলের সঙ্গে গিয়ে আংটিটি বাঁধা দিয়ে পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে আসে।

অনেক আশা করে তিনি ছেলের নাম রেখেছিলেন সত্যেশ। এই নামকরণের পেছনে বিরাট একটা আদর্শ আর আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল তাঁর মনে।

স্যাকরার কথা যদি সত্যি হয় তবে তাঁর একমাত্র ছেলে সত্যেশ তাঁর সব কিছু কামনা-বাসনা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন একেবারে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

সব চাইতে তাঁর আশ্চর্য লাগলো, তরুণ ছেলেটি অপরাধ অস্বীকার করল না কেন? তাহলে তো তিনি তাকে এমন করে জেলে পুরতেন না! লেখাপড়ায় খুব ভালো—ওরা দুটি ভাই। তবু চুরির দিকে ওর মন কী করে গেল—একথা ভেবে সত্যি বীরেশবাবুর বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না।

কিন্তু ছেলেটির একগুঁয়েমি দেখে আর অপরাধ স্বীকার বা অস্বীকার না-করায় তিনি ভারী চটে গিয়েছিলেন। এক বন্ধুর জন্মদিনে নিমন্ত্রিত হয়ে কোন ছেলে যদি চুরি করে, তবে তার কঠোর সাজা হওয়া উচিত—জাঁদরেল উকিল হিসাবে এই কথাই তাঁর বারবার মনে হয়েছিল।

আজ সকালে স্যাকরার কথায় তিনি যেন একেবারে অগাধ জলে পড়ে গেলেন!

প্রথমে স্যাকরাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে আংটিটি উদ্ধার করে নিজের ড্রয়ারে বন্ধ করে রাখলেন।

ভাবলেন সত্যেশকে ডেকে তার চোখের সামনে আংটিটি উঁচু করে ধরেন—তারপর ওর গালে ঠাস-ঠাস করে চড় কসিয়ে দেন। কিন্তু মা-মরা ছেলেটির গায়ে তিনি কোনোদিন হাত তোলেন নি।

সেদিন হঠাৎ একটা কাজ করে ফেলেছিলেন, আজ তাঁর অনুশোচনা হচ্ছে। তাই আচম্‌কা তিনি আর কিছু করবেন না। বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী হিসেবে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করবেন তিনি, তারপর আসল অপরাধীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবেন।

দরকারী কাগজপত্রের নথি তিনি সরিয়ে রাখলেন। উপার্জনের কিছুটা ক্ষতি হবে—তা হোক।

আসল অপরাধী কে, সকলের আগে সেই প্রমাণ তিনি করবেন।

বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে তাঁর ছোট্ট গাড়িখানি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রথমেই তিনি গেলেন সত্যেশদের বিত্তালয়ের প্রথম-শিক্ষকের বাড়ি। তাঁর কাছ থেকে তিনি তরুণের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করলেন।

এ-গলি সে-গলি করে ঘুরতে ঘুরতে বীরেশবাবু একটি মেটে ঘরের সামনে এসে হাজির হলেন। তার ওপাশেই গাছতলায় একটি পানের দোকান। গাড়ি থেকে নেমে পানের দোকানের লোকটির সঙ্গে কথা কইলেন তিনি। দোকানি বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, দুই ভাই আর বিধবা মা—ঐ মেটে ঘরেই থাকে। কিন্তু বড় ছেলেটির তো বাবু জেল হয়ে গেছে। বড় দুঃখী ওরা—দিন চলা কঠিন।

বীরেশবাবুর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতে লাগল। ভাবলেন, ওদের দুঃখের বোঝা তো তিনিই আরো ভারী করে তুলেছেন!

এক-পা দু'পা করে মেটে-ঘরের পেছনে-দিককার একটি জানলার ধারে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

বাঁশের তৈরি জানলা—তারই ফাঁক দিয়ে বীরেশবাবু দেখলেন একটি বিধবা মহিলা মেঝেতে বসে ঠোঙা তৈরি করছেন—আর একটি ছোট ছেলে তাঁরই কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন আবদার করছে।

ছেলেটি বললে, মা, তুমি বারণ কোরোনা। দাদার জন্মতিথি-উৎসব আমি একাই করবো। দাদা আমাদের কাছে নেই বলে কি তার জন্মতিথির উৎসব বন্ধ থাকবে?

বীরেশবাবু এইবার ঘরের ভেতর আর একটু ভালো করে নজর করলেন।

হ্যাঁ, তরুণেরই একটি ফোটো ছোট একটি জলচৌকির ওপর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

মা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, জন্মতিথি করবি কী দিয়ে শুনি! কাউকে তো নেমতন্ন করতে পারবি নে! আমার হাতে পয়সা নেই। এ বছর না-হয় থাক বরুণ। ও যেখানে আছে ভালো থাক!

চোখের জল মুছলেন মা।

বরুণ কিন্তু এ কথায় মোটেই শান্ত হল না। দাপাদাপি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। বললে, তা বই কি! বড়লোকেরা মিথ্যে কথা বলে দাদাকে জেলে পাঠিয়েছে তাই বলে দাদার জন্মতিথি আমি কিছুতেই বন্ধ রাখবো না। ইস্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে আমি চার আনা জমিয়েছি। গতবারের মতো

দাদার বন্ধুদের তো আর নেমন্তন্ন করবো না—শুধু আমার বন্ধু পিণ্টুকে বলেছি। সে এলো বলে, একটা ধূপকাঠি আনতে গেছে।

—তবে যা খুশি কর—আমায় কিছু জিজ্ঞেস করিস নে। নতমুখে ঠোঙা তৈরি করতে করতে মা তেমনি ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন।

—কেন? জিজ্ঞেস করবো না কেন? আল্‌পনা দিয়ে দেবে না তুমি? আবদারের সুরে প্রশ্ন করে বরুণ।

মার মুখে এইবার হাসির আলো ছড়িয়ে পড়ে। সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত রেখে বলেন, তাহলে চল বাবা, চল আলপনা দিয়ে দি।

জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে বীরেশবাবু ইতিমধ্যে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। জীবনে বহু টাকা রোজগার করেছেন তিনি। আজ মনে হল—তার সদ্ব্যয় হয়নি। একমাত্র ছেলে সত্যেশ—তার যে পরিচয় আজ সকালে তিনি পেয়েছেন তাতে বুঝতে পেরেছেন—সে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে।

একটা দিন যেন বিবেকের কাছে বলতে পারেন সত্যি ভালো কাজ করেছেন তিনি। সত্যিই তো, সারটা জীবন শুধু টাকা-আনা-পাই গুনেছেন। তবু যেন মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের খাতায় কোনো জমা নেই...সব ফাঁকা! একটি দিন ছোটদের সঙ্গে মিশে ছেলেমানুষি করবেন তিনি।

নিঃশব্দে সরে এলেন জানলার কাছ থেকে। দ্রুতবেগে নিজের ছোট্ট গাড়িখানি চালিয়ে দিলেন।

শহরের সেরা উকিল তিনি—ছুটে গেলেন কোর্টে। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন আজই তরুণের মুক্তির দিন। কেননা তার একমাসই জেল হয়েছিল।

মনে-মনে তিনি বললেন, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

তাড়াতাড়ি জেলখানায় গিয়ে ফটকের সামনে তরুণকে তুলে নিলেন নিজের গাড়িতে।

তরুণ বীরেশবাবুকে দেখে ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল। বীরেশবাবু ওর হাত দু'খানি ধরে বললেন, তুমি আমার ছেলের মতো—তবু আমি খবর জানতে পেরে তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছি।

তরুণ লজ্জা পেয়ে বলে, না-না, সে কী কথা কাকাবাবু, আপনার স্নেহ ফিরে পেয়েছি—তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এই বলে সে নিচু হয়ে বীরেশবাবুর পায়ের ধুলো নিলে।

বীরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, আর দেরি নয়, ওঠো শিগগির আমার গাড়িতে—

তরুণ উত্তর দিলে, গাড়ির দরকার নেই কাকাবাবু, আমি হেঁটেই যেতে পারবো। আপনার কত কাজ—কোর্ট রয়েছে—

বীরেশবাবু শিশুর মতো হো-হো করে হেসে উঠলেন। —জানো না বুঝি? আজ আমি কোর্ট পালিয়েছি। আজ যে তোমার জন্মদিন! ভাবছ আমি কিছু জানিনে,—সব জেনে গেছি আজ। বরুণ যে তোমার জন্মদিনের উৎসবের আয়োজন করছে। আমরা প্রথমে গিয়ে তোমার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবো, তারপর বাজার করা রয়েছে না! এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই। ওঠো শিগগির!

তরুণ অবাক হয়ে বীরেশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বীরেশবাবু যেন আজ হারানো শৈশব ফিরে পেয়েছেন। রাশি-রাশি খাবার কিনে এনেছেন—সেই মেটে-ঘরে। মাছ, দই, মিষ্টি আসছে ভারে ভারে।

মাকে বলেছেন, আজ আপনাকে রান্না করে ছেলেদের

খাওয়াতে হবে। আমি নিজে পাতা পেতে বসবো ওদের সঙ্গে।

বরুণের তাড়া খেয়ে মা আলপনাটা খুব সুন্দর করে এঁকেছেন। মাটির মেঝেতে সেই আলপনা শুকিয়ে একেবারে ঝকঝক করছে।

বন্ধুরা সব উপহার দেবার জন্যে নিয়ে এসেছে নানারকম বই, ফুলের তোড়া, কলম, আর খাতা।

এক ফাঁকে গিয়ে বীরেশবাবু সত্যেশকে ধরে নিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে। তাকে কিন্তু এই সব ব্যাপারের কিছুই জানাননি।

সত্যেশ তরুণকে দেখে সত্যি হকচকিয়ে গেছে! মাটি থেকে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারছে না।

বীরেশবাবু পকেট থেকে সেই হীরের আংটি বের করে সত্যেশের হাতে দিয়ে বললেন, তোমার বন্ধু তরুণের জন্মদিনে এই আংটি তুমি ওকে উপহার দাও।

এইবার সত্যেশ নিজের ভুল বুঝতে পারলে। সে এগিয়ে গেল তরুণের দিকে—বললে, তরুণ, তুমি আমার ক্ষমা করো—

তরুণ ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলে। দুই বন্ধুর মুখে কোনো কথা নেই। বীরেশবাবু দেখলেন, সত্যেশের চোখে তরল মুক্তাবিন্দু টলটল করছে!

তিনি এইবার ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমার বন্ধুর জন্মদিনে তোমার সুমতি হোক। নিজের নামকে সার্থক করে তোলো—আজ থেকে।

দুই বন্ধু একসঙ্গে বীরেশবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

ওদিকে ছেলের জন্মদিনে মায়ের চোখের জলও আর বাঁধ মানতে চায় না। আনন্দ আর গর্বও তার সঙ্গে মিশে রয়েছে।

শহীদ বেদী

সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যুগের কাহিনী।

সারাটা দিন একরকম হৈ হুল্লোড় করে কাটে। গোটা পাড়া একেবারে যাকে বলে সরগরম।

পড়ুয়াদের ইস্কুল কলেজ যেতে হয় না, চাকুরেদের অফিসে যাওয়া বন্ধ, উকিল-মোক্তার, ব্যারিস্টারদের আদালতে যাবার সাহস নেই—কি জানি, পথে কখন কি অঘটন ঘটে! পাড়ার দু' চারজন ডাক্তার—যাঁরা সকাল থেকে সন্ধে অবধি সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়াতেন—তাঁরাও একেবারে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। ব্যবসায়ীরাও বেকার।

পৈতৃক প্রাণ বাঁচলে তবে তো চিকিৎসে আর ব্যবসা! পাড়া থেকে কেউ বেরুতে পারে না বলেই সারাদিন গোটা পাড়া জম-জমাট থাকে।

সকলের যখন আয় একেবারে বন্ধ সেই সময় খোঁড়া নিত্যানন্দের বৃহস্পতির দশা চলছে। দু'হাতে পয়সা কুড়িয়ে নিত্যানন্দ হাঁফিয়ে উঠছে।

গলির মোড়েই ওর বেগুনি-ফুলুরির দোকান।

যত অকম্মার বিকেল-বেলাটা আর কাটতে চায় না! খেলা-ধূলো সব বন্ধ, পার্কে ময়দানে কোন সভা-সমিতি নেই, জলসা, নৃত্য-নাট্য, সিনেমা দেখার পথে একেবারে পাকা বেড়া। লোকের ব্যবসা নেই বাণিজ্য নেই বেড়ানো নেই, সারাটা সন্ধে সময় কাটে কী করে? তাই ভীড় জমে খোঁড়া নিত্যানন্দের বেগুনি ফুলুরির দোকানের আশেপাশে।

পাড়ার যতগুলি রোয়াক ছিল সব ঘসে-মেজে তক্‌তকে

ঝক্‌ঝকে করা হয়েছে। বিকেল থেকেই প্রত্যেকটি রোয়াক একেবারে সিনেমা হাউসের মত ফুল-হাউস হয়ে ওঠে।

প্রত্যেকটি রকই আবার নানাভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি হচ্ছে বুড়োদের রক। সেখানে হুঁকো থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া উঠছে এবং দেশের কী তুর্দিন উপস্থিত হল—সে সম্পর্কে প্রচুর আলোচনার কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ নিশ্বাস বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। প্রৌঢ়দের রক আলাদা, সেখানে বিপুল চিৎকারে তাস পেটানো চলছে।

পাড়ার বেকার যুবকবৃন্দের একটি পৃথক রক নির্দিষ্ট আছে। সেখানে গোপনে বোমা তৈরির শলা-পরামর্শ চলছে।

ইস্কুলের ছেলেদের রকে লুডো খেলা চলছে সকাল-বিকেল।

কিন্তু প্রত্যেক রকের অধিবাসীরাই এক প্রস্তাবে সবাই একমত যে, খোঁড়া নিত্যানন্দের দোকান থেকে গরম-গরম বেগুনি-ফুলুরি ভাজিয়ে চায়ের সঙ্গে আসর জমাতে হবে।

ফলে নিত্যানন্দ চাহিদা মেটাতে গিয়ে একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে উঠেছে। বিকেল থেকে একা কুলিয়ে উঠতে পারছে না। ওর পিসি বাড়ির ভেতর থেকেও গরম গরম ফুলুরি ভেজে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাই সোনা-মুখ করে গিলছে পাড়ার ছেলেবুড়ো, আণ্ডা-বাচ্চা সব।

নিত্যানন্দের পিসি উনুনে ঘন ঘন কাঠের চ্যালা ঢুকিয়ে দেয় আর বলে, ভাগ্যিস্ দাঙ্গা বেধেছিল—তাই আমাদের নিত্যানন্দ এখন তুপয়সা কামাতে পারছে। মারামারিটা যদি আরো বেশ কিছুদিন চলে তবে আমার নিত্যানন্দ একটা কোঠাবাড়ি তুলতে পারবে।

একেই বলে কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। সব রোয়াকের আসরই দিব্যি জমজমাট চলতে লাগলো, শুধু ইস্কুলের

ছেলেরাই একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কাঁহাতক আর দিন-রাত্তির লুডো খেলে ছয় ফেলবার তপস্যা করা যায়!

দিনের বেলায় তবুও যাহোক গল্পের বই পড়ে, হাতের লেখা পত্রিকা লিখে, ছবি এঁকে দিন কেটে যায়। রাত্তিরের থম্‌থমে আবহাওয়ায় ঘুম যেন আর কিছুতেই আসতে চায় না!

আর মাঝে-মাঝে দূর থেকে সেই বীভৎস চিৎকার ভেসে আসে, ওদের ঘুম যায় ভেঙে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ঘামতে থাকে ছেলের দল।

অনেক সময় মনে হয় বাইরের গুণ্ডাগুলো বুঝি হৈ-হল্লা করে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ল। এইরকম অবস্থা হলে এক বাড়ির সঙ্গে আর-এক বাড়ির সংবাদ চলাচল কী করে করা যায় সে সম্পর্কে একদিন পাড়ার সকলকে নিয়ে এক বিরাট সভা ডাকা হলো।

নানা মুনির নানা মত।

কেউ বললেন, ইট পাটকেল কাঠ দিয়ে গলির মুখ বন্ধ করে দেয়া হোক। কেউ মন্তব্য করলেন, সব বাড়ির ছাদের পিচ জ্বাল দিয়ে রাখা হোক—গুণ্ডা ব্যাটারা এলেই তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে। পাড়ার যুবকেরা বললে, কিছু টাকা-কড়ি চাঁদা তুলতে হবে। আমরা এমন জিনিস তৈরি করে রাখবো যে, বাছাধনদের আর ফিরে যেতে হবে না।

কিন্তু এইখানে প্রতিবাদ করে ছেলেরা। ঘণ্টেশ্বর বললে, বিপদের আভাস পাওয়া গেলে যাতে এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়ি খবর পাঠানো যায় তার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

একজন ইঞ্জিনীয়র বললেন, ঠিক, ঠিক! ছেলেদের মাথা আছে। যুদ্ধের সময় খবর-চলাচল করাটাই আসল দরকার। তার উপরই জয় নির্ভর করে। আপনারা পাড়া থেকে চাঁদা তুলুন, আমি এমন ইলেকট্রিক বেলের ব্যবস্থা করে দেবো যে সুইচ

টিপলেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। কিন্তু ইঞ্জিনীয়র বাবু সেজন্য যে হিসেব দাখিল করলেন তাতে সবাই সাত হাত পিছিয়ে গেল!

ভটচাজ মশাই বললেন, কেন? আমাদের দেশী শঙ্খই তো রয়েছে। কোন একটা বিপদের শব্দ কানে এলেই শঙ্খ বাজিয়ে দেবে—

আবার কেউ সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না না, আমাদের কাঁসর ঘণ্টাই তো রয়েছে। কিন্তু ইস্কুলের ছেলেদের এ প্রস্তাব মনঃপুত হয় না। ওরা চুপি-চুপি বারোয়ারী সভা থেকে বেরিয়ে চলে এলো।

ভোলানাথদের পোড়ো বাগানের পেয়ারাতলায় বসলো ওদের গোপন সভা।

খ্যাঁদারাম বললে, ধরতে গেলে এ তো আমাদের একরকম যুদ্ধই চলেছে, কাজেই—

ওর মুখের কথাটা লুফে নিয়ে চটপটি উত্তর দিলে, নিশ্চয়, যুদ্ধই তো! সেই যুদ্ধের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যে আমাদের বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থাকেই মেনে চলতে হবে।

কাসুন্দী নাকটা কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কী সেই বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থা? সেইটেই আগে খোলসা করে বলো শুনি—

ঘণ্টেশ্বর বললে, পায়রা পুষতে হবে।

পায়রা! সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে। পায়রা তো লোকে খায় শুনেছি। মন্তব্য করলে কাসুন্দী। ভোলানাথ ফোড়ন কাটলে, হ্যাঁ, পেঁয়াজ-লঙ্কাবাটা দিয়ে তোফা হয়!

ঘণ্টেশ্বর রেগে উঠে উত্তর দিলে, তোর মুণ্ডু হয়! যুদ্ধের ইতিহাস পড়িস নি? শিক্ষিত পায়রা যুদ্ধের সময় এক শিবির থেকে আর-এক শিবিরে সংবাদ নিয়ে চলে যায়। আবার সেই খবরের জবাব নিয়ে ফিরে আসে।

ঠিক, ঠিক! একটা বইয়ে পড়েছিলাম বটে! উত্তর দিলে চটপটি। গম্ভীর ভাবে ঘণ্টেশ্বর বললে, আমরাও ঠিক সেই রকম ভাবে পায়রা জোগাড় করে নেবো।

ভোলানাথের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা, কিন্তু পায়রাকে ট্রেনিং দেবে কে?

ঘণ্টেশ্বর নাছোড়বান্দা। উত্তর দিলে, কেন, আমরাই ট্রেনিং দেবো। কুকুরকে শেখানো যায়, ভালুককে শিখিয়ে নাচানো চলে, বানরকে শিক্ষা দিয়ে কসরৎ দেখানো হয়, আর আমরা এতগুলি ছেলে একটি নিরীহ প্রাণী পায়রা, তাকে ঠিকমতো শিখিয়ে নিতে পারবো না?

ওর কথায় সবাইকার উৎসাহ বেড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল একসঙ্গে, ঠিক, ঠিক! কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? পায়রা জোগাড় হবে কোত্থেকে?

এখন তো আর সহরের সে অবস্থা নয় যে চট্‌ করে বাসে চেপে বৈঠকখানার বাজারে চলে গেলাম, তারপর পায়রা হোক, রাম-পাখি হোক যা হয় একটা কিনে নিয়ে এলাম! ছেলেদের মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে ওঠে।

তাই তো! এমন সুন্দর একটা প্ল্যান সামান্য একটা পায়রার অভাবে এমন করে ভেস্তে যেতে সবাই ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ে—কেউ কোনো হদিস পায় না। হঠাৎ ভোলানাথ লাফিয়ে উঠে বললে, হয়েছে হয়েছে—মিলে গেছে!

কাসুন্দী উত্তর দিলে, কোথায় মিললো? তোর মগজে নাকি?

ভোলানাথ উত্তর দিলে, ঠাট্টা নয় রে, ঠাট্টা নয়। তবে বলি শোন। আমাদের পাড়ার উত্তর কোনে ঐ যে ভুতুড়ে বাড়িটা আছে—ওর ভেতর প্রচুর পায়রা বকবকম-কম করছে।

চটপটি ভয়ে-ভয়ে চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু ঐ ভুতুড়ে বাড়িতে ঢুকবে কে শুনি ?

ঘণ্টেশ্বর মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, যদি বলি চটপটি ঢুকবে—

তিড়িং লাফ মেরে চটপটি আঁৎকে উঠে বললে, ওরে বাবা, আমি দিনের বেলাতেও ও বাড়িতে ঢুকতে পারবো না !

কাসুন্দী ফোঁড়ন কাটলে, বেশ তো, দিনের বেলা ঢোকায় যদি অসুবিধে থাকে তাহালে নিশুত রাত্তিরে ঢুকিস।

এবার আর চটপটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু শব্দ শোনা গেল—হুঁ !

কিন্তু পায়রার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে—ঘণ্টেশ্বর তখন আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তুড়ি মেরে বললে, ফুঃ! এই বিংশ শতাব্দীতে শহরের বুকের উপর ভূত ? ভূত যদি থাকতো তাহলে তো এই পায়রাগুলোকেই ওরা ধরে ধরে খেয়ে ফেলতো !

ভোলানাথ এইবার উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, তা তো নয়-ই, বরং ছানা-পোনা নিয়ে ওরা গোটা বাড়ি দখল করে বসেছে।

ভূতের ভয়টা কিন্তু ছোঁয়াচে। একবার ওর নিশ্বাস গায়ে লাগলে সহজে যেতে চায় না। ফলে সবাই আমতা-আমতা করে, কেউ আর এগুতে চায় না।

শেষকালে ঘণ্টেশ্বর চটে উঠে বললে, এতই যদি তোদের প্রাণের মায়া, তবে থাক তোরা ঘরের কোনে বসে। কাউকে যেতে হবে না, আমিই গিয়ে একটা পায়রা ধরে নিয়ে আসতে পারবো।

সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। চটপটি বললে, রাগ না, লক্ষ্মী। এমনি মাঝে মাঝে একটু-আধটু রাগ হলেই তো ভালো।

কাসুন্দী ফোঁড়ন কেটে বললে, পুরুষমানুষের রাগ থাকা ভালো, ওতে জীবনে উন্নতি হয়।

ঘণ্টেশ্বর আর ওদের কোনো কথার উত্তর দিলে না। কিন্তু ওর যে কথা সেই কাজ। পরদিন দেখা গেল, ঠিক একটা পায়রা ধরে নিয়ে এসেছে।

ছেলে-মহলে একেবারে হুল্লোড় পড়ে গেল। ওদের নিষ্কর্মা জীবনে কাজের মতো একটা কাজ জুটেছে। আর সত্যি কথাই তো! দায়িত্ব তো বড় কম নয়!

একটি পায়রাকে রীতিমত ট্রেনিং দিতে হবে, যাতে সে এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়ি অন্ধকারের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে। ঘণ্টেশ্বরের দাবী সব চাইতে বেশি কারণ সে পায়রাটা খুঁজে-পেতে জোগাড় করে নিয়ে এসেছে। সকলের সম্মতিক্রমে সে-ই হল দলের গোদা। মানে—'লিডার অব্ দি পার্টি'।

প্রচুর উৎসাহ নিয়ে ছেলের দল পায়রাটাকে শিক্ষা দেবার কাজে লেগে গেল।

কাসুন্দীদের সোনা রুপোর দোকানে আছে। সে বললে, আমি পায়রাটার পায়ে রুপোর ঘুঙুর পরিয়ে দেবো। দেখতে ভারি সুন্দর হবে।

চটপটি বললে, আমি চটপট ওকে অ—আ—ক—খ আর A—B—C—D শিখিয়ে দেবো। সেই যে একটা সিনেমায় দেখেছিলাম একটা ওরাং-ওটাং কেমন চমৎকার লেখাপড়া করতে পারে! ওরাং-ওটাংএর মগজে যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে আমাদের পায়রা আর লেখাপড়া শিখতে পারবে না!

ভোলানাথ বললে, আমি ভার নিলাম—ওকে বিভিন্ন দিকটা শিখিয়ে দেবো। কোনটা উত্তর, কোনটা দক্ষিণ, কোনটা পূর্ব আর কোনটা পশ্চিম—ও ঠিক ঠিক জেনে নিতে পারবে।

যুদ্ধের ব্যাপার—দিকভ্রম হলে আর রক্ষে আছে! হয়ত শত্রুপক্ষের শিবিরে গিয়ে হাজির হবে!

খ্যাঁদারামই বা পিছিয়ে থাকবে কেন ?

সে এগিয়ে এসে শুধোল, তোরা তো সবাই এক-এক জনে এক-একটা ভার নিচ্ছিস, কিন্তু আসল কাজেই যে গলদ রয়ে গেল !

সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল—

অ্যাঁ ! গলদ ? কী গলদ শুনি ?

—গলদ নয় ? তেড়ে এল খ্যাঁদারাম।

সক্কলের আগে পায়রাটার একটা নাম ঠিক করতে হবে তো ? কী বলে ওকে ডাকবো আমরা শুনি ?

তখন সকলের খেয়াল হল।

হ্যাঁ, সত্যি কথাই তো ! পায়রাটার একটা নাম ঠিক করা চাই ! নইলে, যে পড়ুয়ার নাম নেই, কী করে তাকে শিক্ষা দেওয়া যাবে ?

খ্যাঁদারাম মাথা দোলাতে থাকে।

—হুঁ ! হুঁ ! তোরা আঁকু-পাঁকু করলে কী হবে ? নাম আমি একটা ঠিক করে ফেলেছি।

পরম বিজ্ঞের মত খ্যাঁদারাম মত প্রকাশ করে। ঘণ্টেশ্বর অসহিষ্ণু হয়ে উত্তর দেয়, আহা নামটা যদি ঠিক করেই থাকিস তো বলে ফ্যাল্ না !

খ্যাঁদারাম জিভটা দুই ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নিয়ে বললে, নাম হবে ওর 'উড়ন্ত চাকি'—

সবাই একসঙ্গে সমর্থন-সূচক উল্লাসধ্বনি জ্ঞাপন করে।

—চমৎকার নাম হয়েছে !

—বিউটিফুল !

—মার্ভেলাস !

—উড়ন্ত চাকি ! হ্যাঁ একটা নামের মত নাম বটে !

—তোর মাথা আছে খ্যাঁদারাম ! বেছে-বেছে নামটা দিয়েছিস বেড়ে !

এই জাতীয় প্রশস্তি-বচনে খ্যাঁদারাম সম্বর্ধিত হতে থাকলো।

উড়ন্ত চাকিকে নিয়ে পাড়ায় তখন উড়ো খবর কত ছড়াতে লাগলো।

কেউ বললে, পায়রাটা ভূতসিদ্ধ, এতদিন ভুতুড়ে বাড়িতে ছিল। কেউ রটিয়ে দিলে, অসাধ্য সাধন করতে পারে এই পায়রা। আবার ফিস্-ফিস্ করে কেউ মন্তব্য করলে, মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলে আর রক্ষে নেই! গুণ্ডার দল মবে একেবারে ভূত হয়ে থাকবে।

গভীর রাত্তিরে উড়ন্ত চাকি শ্মশানে চলে যায় আর এক কাপালিকের হাত থেকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা পরে আসে—পাড়ার কেউ কেউ নাকি এ ব্যাপারটাও দেখেছে!

এ-হেন ভূতসিদ্ধ উড়ন্ত চাকিকে নিয়ে পাড়ার ছেলেমহলে যে একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

উড়ন্ত চাকির থাকবার জায়গা হল ভোলানাথদের বাড়ি। একটা ঝুড়ির তলায় ওকে রেখে দেওয়া হল।

ভোলানাথ সগর্বে ঘোষণা করলে যে, সে শিগ্গির একটা কাঠের বাক্স দিয়ে সুন্দর ঘর তৈরি করছে। সেইখানেই হবে উড়ন্ত চাকির আস্তানা।

ইতিমধ্যে ট্রেনিং দেয়ার কাজ পুরোদমে চলতে থাকলো। দলের গোদা ঘন্টেশ্বর সারা সকাল এসে যা শেখায়—তুপুর বেলায় চটপটি এসে সব ভুলিয়ে দেয়। তার শেখাবার প্রণালী সম্পূর্ণ আলাদা।

আর খ্যাঁদারাম যে চুপি-চুপি সন্ধের পর এসে কী শেখায় তা কেউ বলতে পারে না।

আর, কথায় বলে, ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে।

সেই ওস্তাদী বুদ্ধি ভোলানাথের মাথায় খেলছে!

গভীর রাত্তিরে ঐ পায়রাটাকে নিয়ে ভোলানাথ ছাদে কী করে?

এই তো একদিককার খবর। অন্যদিকে আরো মজাদার খবর আছে।

উড়ন্ত চাকিকে খাওয়ানো নিয়েও ছেলেদের মধ্যে বেশ লুকোচুরি খেলা চলছে। কে যে কখন ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে এসে পায়রাটাকে কী বস্তু খাইয়ে যাচ্ছে—দেবতারাও বুঝি তার সন্ধান রাখেন না।

কেউ খাওয়াছে ক্ষুদ, কেউ পকেট-ভর্তি নানাজাতীয় শস্য, অন্য কেউ ছাতু, পোকা-মাকড়ও কৌটোতে পুরে নিয়ে আসছে উৎসাহী ছেলেরা।

গোপনে আবার অনেকে বিজ্ঞানের বই পড়তে শুরু করেছে। পায়রা কখন কী খায়, সব জেনে নিতে হবে তো!

এত আদর অভ্যর্থনার চাপে পড়ে পায়রাটা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। কিন্তু মাষ্টার মশাইদের সেজন্য উৎসাহের বিন্দুমাত্র কামাই নেই। তারা সবাই পণ করেছে উড়ন্ত চাকিকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেবেই।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্লাশ বসছে, কিন্তু কেউ কারো ট্রেনিংএর কথা অপরকে জানাচ্ছে না। প্রত্যেকেরই মনের বাসনা—তারই শিক্ষায় পায়রাটা রাতারাতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে উঠুক।

ওদিকে পাড়ার ছেলেরা ক্রমাগত ভোলানাথের পেছনে লেগেই আছে। কবে উড়ন্ত চাকির জন্য কাঠের ঘর তৈরি হবে সেটা না জানতে পারলে তাদের পেটের ভাত হজম হচ্ছে না।

ভোলানাথ বলে, আমি ভালো মিস্ত্রির কাছে অর্ডার দিয়েছি। এমন নক্সাকাটা সুন্দর কাঠের ঘর তৈরি করে দেব যে, তোদের সবাইকার দেখে একেবারে তাক লেগে যাবে!

ছেলেরা তো অবাক হয়ে ভিরমি খেয়ে পড়তে চায়। কিন্তু সেই সুযোগ তাদের দিতে হবে তো ?

ইতিমধ্যে কে কে যেন রটিয়ে দিয়েছে যে, ভূতসিদ্ধ এই পায়রার এক টুকরো পালক নিয়ে মাতুলি করে ধারণ করলে লোকের অসুখ-বিসুখ সারে, কানা ও অন্ধের চোখ মেলে, বিকলাঙ্গ পূর্ণ দেহ ফিরে পায়, অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন মেলে !

এই খবরের পর পাড়ার মেয়েমহলে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

অমূল্যর পিসি, ন্যাদার দিদিমা, ফট্‌কের মাসি, কার্তিকের ঠাকুমা, ক্যাবলার ঠানদি সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ভোলানাথদের বাড়ি।

—ও বাবা ভোলানাথ, আমার জন্য এক টুকরো পালক তুলে দে। একশো বছর তোর পরমাই হবে। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে তোর।

কিন্তু ভোলানাথ একেবারে মারমুখো, একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে করে ক্রমাগত মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে আর বলছে, খবরদার, কেউ উড়ন্ত চাকির কাছে এগুবে তো তার মাথা আমি গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবো !

ওর ঐ মারমূর্তি দেখে সবাই শাপ-মন্যি দিতে দিতে ঘরে ফিরে গেছে।

হুঁ! এত বাড় ভালো নয়! আমরা পাড়ার ঠানদি, পিসিমা, দিদিমা, মাসিমা……আমাদের এমনি করে ফিরিয়ে দেয়া! তে-রাত্তির পোয়াবে না! দেখে নিস…বলে দিলাম একটি কথা।

ভোলানাথ রসিকতা করে উত্তর দিলে, হুঁ! শকুনের শাপে যদি গোরু মরতো তাহলে আর ভাবনা ছিল না! এখন আমি দিব্যি করে খাবো-দাবো, তারপর, উড়ন্ত চাকিকে এমন ট্রেনিং দেবো যে, কোনো শাপ-মন্যি তার গায়ে লাগবে না।

ছুতোর মিস্ত্রিটা বলেছে, কাল সকালে সে পায়রার কাঠের বাসা তৈরি করে দিয়ে যাবে। সেইটে দেখবার জন্য পরদিন সকালবেলা পাড়ার ছেলেদের দারুণ ভীড় হবে—উড়ন্ত চাকির গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে ছেলেদের গরম মুড়ি আর বেগুনি খাওয়াতে হবে।

অনেক রাত্তির পর্যন্ত ছাদে নিয়ে গিয়ে ভোলানাথ পায়রাটাকে কি যেন সব শেখালে। তারপর রোজকার মতো ওকে ঝুড়িটার তলায় চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমের ভেতর শেষ রাত্তিরে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল যে উড়ন্ত চাকির গৃহ-প্রবেশ উৎসব হচ্ছে। পাড়ার ছেলেরা নানারকম সাজে সেজে এসেছে। ঘণ্টেশ্বর যেন সানাইয়ে পোঁ ধরেছে। কিন্তু উড়ন্ত চাকি কিছুতেই নতুন কাঠের বাড়িতে ঢুকবে না। প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে সে।

হঠাৎ একটা ঝটপট শব্দ আর বিচ্ছিরি আওয়াজ শুনে ভোলানাথের ঘুম ভেঙে গেল।

কী সাংঘাতিক কাণ্ড!

ঝুড়িটার তলায় পায়রাটা দিব্যি চাপা দেওয়া ছিল, কোত্থেকে ওদের হুলো বেড়ালটা এসে ঝুড়িটা উল্টে দিয়ে উড়ন্ত চাকির টুঁটি কামড়ে ধরেছে।

একটা দারুণ চিৎকার করে পায়রাটা নেতিয়ে পড়ল। ভোলানাথ যে কী করবে কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তাদের এত সাধের উড়ন্ত চাকি শেষকালে এইভাবে পটল তুললো?

ঐ যে কথায় বলে—দুঃসংবাদ বাতাসের আগে যায়! দেখতে দেখতে এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেদের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ল সকলের আগে। তাদের সবাইকার মুখে কে যেন

বোবা কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। না পারছে এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখতে, না পারছে প্রাণ খুলে দু-দণ্ড কাঁদতে!

ইতিমধ্যে পাড়ার ঠানদি, পিসিমা, দিদিমার দলও এসে হাজির। দাঁতে মিসি দিয়ে তাঁরা কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝগড়া করতেই এসেছেন।

বললেন, আমাদের শাপ-মন্যিতে নাকি কোনো কাজ হয় না! তখনই বলেছিলাম এত বাড় ভাল নয়! শকুনের শাপে গোরু মরে কি না এবার তাকিয়ে দেখ সবাই!

এত শক্ত শক্ত কথা শুনেও ছেলের দল আদপেই চটলো না। ওরা যেন সবাই স্ট্যাচু হয়ে গেছে!

এ সময় কী করা উচিত, কী বলা উচিত,—ওরা যেন ভুলে গেছে! এই অসহ্য নীরবতা কি চিরকাল ধরে থাকবে?

হঠাৎ দেখা গেল, ঘণ্টেশ্বর ভেউ ভেউ করে কাঁদছে! তারপর সে চিৎকার করে বললে, শহীদ হয়েছে আমাদের উড়ন্ত চাকি!

—অ্যা! শহীদ!

ছেলের দল বিস্ময়ে, বেদনায় আর উল্লাসে আর্তনাদ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে!

ঘণ্টেশ্বর বললে হ্যাঁ, শহীদই তো! ও এসেছিল গুণ্ডাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে। এমনি সাংঘাতিক ভাবে সে আত্মোৎসর্গ করল! শহীদের দুর্লভ স্থান অধিকার করেছে আমাদের উড়ন্ত চাকি! তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতেই হবে।

ঠাকুমা, পিসিমা, দিদিমার দল মুখ-ঝামটা দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে ফোঁড়ন কাটলে, হুঁ, এইবার যাও সবাই, খুড়োর গঙ্গা-যাত্রা করাওগে।

কিন্তু ছেলের দল আজ আদপেই চটলো না।

ভোলানাথ বললে, তুই ঠিক বলেছিস ঘণ্টেশ্বর। উড়ন্ত চাকি শহীদ হয়েছে। ওর মৃতদেহ নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করতে হবে।

চটপটি বললে, আমি তাড়াতাড়ি একটা শোক-সঙ্গীত লিখে নিয়ে আসি। শোকযাত্রার পরিচালনার সময় সবাই মিলে সেই গানটা কোরাস গাইতে হবে।

খ্যাঁদারাম বললে, নিশ্চয় ! আমি হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসি আমাদের বাসা থেকে ; একটা রিহার্সাল দিয়ে নিতে হবে তো !

কাসুন্দী এইবার এগিয়ে এলো। বললে, একটা শহীদ-বেদী তৈরি করতে হবে। আমি জন-কয়েককে নিয়ে পাড়ার যত ইট পাবো সব কুড়িয়ে নিয়ে আসবো।

খ্যাঁদারাম শুধোলো, কিন্তু শহীদ-বেদী কোথায় তৈরি হবে ?

বুক চিতিয়ে এল ভোলানাথ। উত্তর দিলে, আমাদের বাগানের পেয়ারা গাছের তলায় শহীদ-বেদী হতে পারবে। তাতে ভাবনা কী ?

কোথা থেকে এলো রাশি রাশি ফুল, কে যেন নিজের টেবিল-ক্লথ ছিঁড়ে সাদা কাপড় নিয়ে এলো। তাই দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে দেয়া হবে। ছেলেরা এক শোক-যাত্রা বের করে শোক-সঙ্গীত গাইতে গাইতে পেয়ারা-তলার দিকে এগিয়ে চললো। ইতিমধ্যে বহু ভাঙা আর আস্ত ইট সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে।

তাই দিয়ে শহীদ-বেদী তৈরি করা হবে।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। যদি তোমরা কোনোদিন নাম ভুলে গোকুল গণেশ গন্ধবণিকের গলিতে ঢোকো তো দেখতে পাবে—ভোলানাথদের সেই পোড়ো জমির পেয়ারাতলায় সেই শহীদ-বেদী আজও আছে।

শিকল খোলার খেলা

সারাটা দিন ধনুর বড় ধকল গেছে !

একটা উৎসবের জন্যে তৈরি হওয়া কি সোজা কথা ? আসছে কাল স্বাধীনতা-উৎসব। তাই গোটা দিন ধনুর এতটুকু বিশ্রাম ছিল না।

গত বছরেব পুরোনো কেডস্ জুতো কোথায় কয়লার ঘরে পড়ে ছিল, সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার হ্যাঙ্গামাই কি কম ? সেটাকে বদ্দুরে শুকোও, সাদা রঙ লাগাও—অনেক পরিশ্রমেব ব্যাপার। এ ছাড়া সাদা জামা আর সাদা প্যাণ্ট পরে যেতে হবে। সেগুলোকেও সাবান দিয়ে বকের পাখার মতো ফরসা করতে হল।

সন্ধে হতে না হতেই তাই ধনুর দু'চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে। রান্নাঘরে বৌদিব কাছে গিয়ে বললে, যা হয়েছে আমায় তাই থালায় করে দাও। বড্ড ঘুম পেয়েছে, আবার কাল ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতে হবে।

মুচকি হেসে বৌদি উত্তর দিলে, কাল তো খুব স্বাধীনতা-উৎসব করবে। তা, তোমাদের এই রান্না-ঘর থেকে আমায় স্বাধীনতা দিতে পারো না ? তা হলে ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচি !

ধনু মাথা দুলিয়ে বললে, কিছু তুমি ভেবো না বৌদি ! আমি আর একটু বড় হই, অনেক টাকা রোজগার করে আনি, তখন তোমার দুটো দাসী আর একটা রাঁধুনী বামনী রেখে দেবো।

বৌদি সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়ন কেটে উত্তর দিলে, আর আমি লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো লক্ষ্মীপ্যাঁচার ওপর বসে সকলের পূজো নি !

—ঠিক বলেছ তুমি বৌদি ! আমাদের লক্ষ্মী-ঠাকরুণ তো তুমিই ! ভাত মাখতে মাখতে ধনু উত্তর করে।

কোনো রকমে গরম-গরম মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে ধনু ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখতেও ভুল করে না।

সারাদিন সত্যি ওর পরিশ্রম গেছে। জাতীয় পতাকা তৈরি করেছে অনেকগুলি। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে প্রভাত-ফেরিতে বেরুবে। পাড়ার ছেলেদের ও-ই নেতা কি না! ও যে দিকটা না দেখবে সেইদিকেই নাকি কি গোলমাল লেগে যায়।

কাজেই সারাদিন এমন দৌড়-ঝাঁপ করলে সন্ধেবেলাই যে দুচোখ ঘুমে ঢুলে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

ধনু বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর একটা আলাদা ছোট্ট ঘর আছে। সেইখানেই সে পড়াশোনা করে আর রাত্তিরে ঘুমোয়। ছাদের এক কোনে ছোট্ট নিরিবিলি ঘরটি। কাজেই ওখানে কেউ তাকে জ্বালাতন করতে আসে না।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে ধনু। হঠাৎ তার মনে হল ওর ঘরের জানলা দিয়ে ডানা-ঝটপট করে কি যেন ঢুকল। তারপর ওর শিয়রের কাছে এসে চুপ করে বসল। না, এর পর ফিস্-ফিস্ করে কি যেন বলছে ওটা!

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে ধনু। কী আশ্চর্য! বৌদির পোষা ময়না পাখিটা না?

সত্যিই তো! সেই ময়নাটা এসেই তো ওর বালিশের এক কোণে বসেছে। আরো আজব কাণ্ড…ময়নাটা কথা বলছে!

ময়না ফিস্-ফিস্ করে শুধোলে, আচ্ছা ধনু দাদাবাবু, তোমরা তো কাল সকালে স্বাধীনতা উৎসব করবে?

ধনু উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, উৎসব করবো বৈকি। খুব সুন্দর উৎসব হবে আমাদের। শেষ রাত্তিরে প্রভাত-ফেরি, সকালে মাঠে সমবেত ব্যায়াম। দুপুর বেলা সঙ্ঘ-ভোজ। আর

সন্ধেবেলা আমাদের অভিনয়। ময়না, তোমাকেও আমি নেমন্তন্ন করছি।

খিল-খিল করে বিশ্রী সুরে হেসে উঠল ময়না। বললে, ভাই ধনু বাবু, তোমরা তো স্বাধীনতা-উৎসব করছ, কিন্তু আমার পায়ে শেকল বেঁধে রেখেছ কেন? আমার কি নীল আকাশের বুকে পাখা মেলে উড়তে ইচ্ছে করে না?

ধনু মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ঠিকই তো! একথা তো ভাই কোনো দিন ভাবি নি!

ময়না আবার সেইরকম শব্দ করে বললে, এই বার থেকে একটু-একটু করে ভেবো। তোমবা মজা করে হুল্লোড় করে বেড়াবে, গান গাইবে, ভোজ খাবে, অভিনয় করবে, আর আমিই শুধু শেকলে বাঁধা থাকবো? স্বাধীনতা কার না ভালো লাগে বলো?

ধনু ময়নাটাকে কি বোঝাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, পাখিটা আর সেখানে নেই, কোথায় ফুড়ুৎ কবে পালিয়ে গেছে।

ধনু আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ বাদে কুকুরের কান্নায় ধনুর ঘুম আবার ভেঙে গেল। ওর দাদার পোষা টেরীটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে!

ধনু বিরক্ত হয়ে বললে, কী রে, আজ রাত্তিরে আমায় ঘুমুতে দিবি নে? জানিস, কাল ভোর চারটেয় আমায় উঠতে হবে?

টেবী ভোক-ভোক করে উত্তর দিলে, সে কথা তো জানি। তোমাদের স্বাধীনতা উৎসবের কত কাণ্ড, কিন্তু অন্যকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে এ তোমাদের কেমন উৎসব শুনি?

ধনু আশ্চর্য হয়ে শুধোলে, কাকে আবার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলাম আমি!

টেবী মুখ ভেংচে উঠে উত্তর দিলে, বা রে! আমাকে তোমরা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখো নি? তোমরা বুঝি মনে করো যে, ছুটো

মাংসের টুকরো দিলেই আমরা সারা জীবন তোমাদের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চাই? স্বাধীনতা তোমার যেমন ভালো লাগে, আমারও ঠিক তেমনি।

ধনু টেবীর কথা শুনে খানিকটা গুম হয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, বিশ্বাস করো ভাই টেবী, শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলে যে তোমার কষ্ট হয়, সে কথা কিন্তু আমি একবারও ভাবি নি। বাড়ির সক্কলের ধারনা, টেবী আমাদের ভালোবাসে তাই রাত জেগে সারা বাড়ি পাহারা দেয়।

টেবী দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

—কিন্তু স্বাধীনতা হারিয়ে সারা জীবন গোলাম হয়ে থাকতে কার ভালো লাগে আমায় বলতে পারো? তোমায় যদি কেউ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো,···সত্যি করে বলো দেখি, ভালো লাগতো তোমার?

ধনু ভয়ে আঁতকে উঠে উত্তর দিলে, না না, কেউ বেঁধে রাখলে আমার একটুও ভালো লাগতো না!

এইবার টেবী একটু নরম হল। বললে, তাহলেই বুঝে দেখ! তোমার নিজের যে জিনিসটা আদপেই ভালো লাগে না ···অপরকে সে কষ্ট দেওয়া কেন বাপু? গলায় বকলস আর তার সঙ্গে শেকল আমি কত কাল বয়ে নিয়ে বেড়াবো?

ধনু মুখখানা ছোট করে বললে, সত্যি টেবী, তোমার ভারি কষ্ট, আমি বুঝতে পারছি! দাদা যাতে তোমাকে আর অমন করে সারাদিন বেঁধে না রাখে আমি সে কথা তাকে বলবো।

আর আমাকে আধপেটা খাইয়ে রাখা? সেটা বুঝি দোষের নয়? ভোক-ভোক করে আপত্তি জানায় টেবী।

ধনু মুখখানা কাঁচু-মাচু করে উত্তর দিলে, সত্যি টেবী, তোমার অসুবিধের কথা সব আমি দাদাকে বলব।

ও মা! তাকিয়েই দেখে, টেবী আর সেখানে নেই। একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে!

নাঃ এরা ওকে রাত্তিরে ঘুমুতে দেবে না! বাকি যতটুকু রাত আছে একটু না ঘুমিয়ে নিলে চলবে না। পরের দিনও অনেক পরিশ্রম। ধনু পাশ ফিরে আবার চোখ বুঁজলে।

আরো খানিকক্ষণ বাদে জানলার ধারে আবার কিসের শব্দ। ধনু মাথাটা উঁচু করে দেখলে, সর্বনাশ! জ্যাঠামশায়ের শ্যামলী গাইটা জানলার ভেতর দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে! ওটা আবার ছাদের ওপর উঠে এলো কী করে?

শ্যামলী হাম্বা বলে একটা ডাক ছাড়লে। তারপর বললে, ওগো ধনুবাবু, খুব তো আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছ। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি?

—কেন, তোমার আবার কী হল? বিরক্ত কণ্ঠে ধনু জিজ্ঞেস করে।

শ্যামলী বললে, হুঁ! এখন আবার বোকা সাজা হচ্ছে! কয়েকদিন হল আমার বাছুর হয়েছে। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে তোমরা আমার দুধ দুইয়ে নিয়ে খাচ্ছ না? বাছা আমার বাঁটের দুধ না পেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে—সেটা কি তোমরা লক্ষ্য করছ?

ধনু আঁৎকে উঠল! বললে, তাই তো! আমরা রোজ যে দুধ খাই—আর বেশিটাই তো বাছুরের পাওনা। আমরা একবারও সে-কথা ভেবে দেখিনে!

হাম্বা শব্দে প্রতিবাদ জানালো শ্যামলী গাই। বললে, ভেবে তো তোমরা দেখবই না! মানুষ জাতটাই বড় স্বার্থপর! যে তার উপকার করে—তারই সর্বনাশ করে মানুষ! তোমরা আমার দুধ খাও, তাতে তো আমি আপত্তি করছি নে? কিন্তু আমার

বাছুর যাতে বাঁচে তার ব্যবস্থা করে তবে তো তোমরা দুধ খাবে? সবটাই তোমাদের চাই? এ জন্যে তোমাদের চাকরটা যে আমার ওপর অত্যাচার করে সে ব্যাপারটা তোমরা কেউ তাকিয়েই দেখ না! এ কাজটা কি ভালো? তুমিই বলো না শুনি?

ধনু ভারি লজ্জা পেল শ্যামলীর কথায়। আমতা আমতা করে উত্তর দিলে,—দেখ শ্যামলী, আমরা আমাদের দোষ স্বীকার করছি।

আবার হাম্বা করে উঠল শ্যামলী। বললে, শুধু স্বীকার করলেই তো হবে না! তোমরা মজা করে স্বাধীনতা-উৎসব করবে, আর আমার দুধের বাছা এক ফোঁটা মায়ের দুধ পাবে না—এই তোমাদের বিচার! এ তোমাদের কী রকম স্বাধীনতা-উৎসব, আমায় একটু বুঝিয়ে বলো তো ধনুবাবু?

ধনুর মুখে আর বাক্যি নেই! বললে, তুমি সত্যি কথাই বলেছ শ্যামলী। কাল থেকে তোমার বাছুর যাতে পেটে পুরে দুধ খেতে পায় আমি সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবো।

মনে থাকে যেন! শ্যামলী সাবধান করে দিলে ধনুকে।

হঠাৎ জানলার দিকে চোখ পড়তেই দেখে, শ্যামলী সেখানে নেই। একেবারে চক্ষের পলকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে!

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল ধনুর। তাড়াতাড়ি ছাদে বেরিয়ে এলো। বুঝতে পারল, সারা রাত ধরে সে স্বপ্ন দেখেছে!

পূব দিকে তাকিয়ে দেখে—লাল সূর্য উঠছে। জবাফুলের মতো রক্তিম। সেই দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, স্বাধীনতার উৎসবের আগে তাকে শেকল খোলার ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

দু'হাত একত্র করে ধনু এই প্রথম প্রণাম জানালো সূর্যি-মামাকে।